এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করবেন। লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার কোন ক্ষতি হোক, তা আমরা চাই না।

বাংলাপিডিএফ.নেট

WWW.BANGLAPDF.NET

পাতাল অভিযান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৮

এক

জার্মানীর হ্যামবুর্গ শহরের কনিগ স্ত্রাস স্ট্রীটের পুরানো একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকতেন অধ্যাপক লিডেনব্রক, আমার ছোটকাকা।

রসায়ন, ভূতত্ত্ব আর ধাতু বিজ্ঞানে গবেষণা করে করে অধ্যাপক লিডেনব্রক কতটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এখন আর তার বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। বছর পঞ্চাশ হবে তখন ছোটকাকার বয়স। কিন্তু অত বয়সেও তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা যুবকদের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম ছিল না।

ভূতত্ত্বে ছিল আমার আগ্রহ। ছোটকাকা নিজে আমাকে এ-বিষয়ে পড়াতেন। ফলে অল্পদিনেই অধ্যাপক লিডেনব্রকের সহকারী হিসেবে বৈজ্ঞানিক-মহলে আমার নামও ছড়িয়ে পড়েছিল।

কনিগ স্ত্রাস স্ট্রীটের পুরানো বাড়িটাতে ছোটকাকার সঙ্গে থাকতাম আমি, অনেকদিনের পুরানো ঝি বুড়ি মার্থা, আর ছোটকাকার ধর্মকন্যা গ্রোবেন। গ্রোবেন অবশ্য হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত, কিন্তু সপ্তাহ শেষে একবার করে বাড়ি আসাটা নিয়ম ছিল তার।

দিনটা ছিল পনেরোই মে, সোমবার। কড়া এক কাপ কফি নিয়ে বসেছি, এমন সময় বাড়ি ফিরলেন ছোটকাকা। হাতে একটা মোটা বই। কোন দিকে না তাকিয়ে ঝড়ের বেগে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। হাতের ছড়িটা এককোণে ছুঁড়ে দিয়ে আছড়ে ফেললেন টেবিলের উপর। তারপর উঁচু গলায় আমাকে ডাকতে শুরু করলেন: 'অ্যাকজেল! অ্যাকজেল!'

হৈ-চৈ করা স্বভাব ছোটকাকার। কফির কাপটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে এসে ঢুকলাম। পড়ার ঘর না বলে ওটাকে যাদুঘর বলাই উচিত। পৃথিবীর সমস্ত খনিজ পদার্থের নমুনা সে ঘরে থরে থরে সাজানো। সংগ্রহের দারুণ বাতিক ছিল ছোটকাকার।

ঘরে ঢুকেই দেখলাম, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ছোটকাকা সেই মোটা বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে তৃপ্তির সুরে বলছেন: 'আহা, কি চমৎকার বই!'

ছোটকাকার মাথায় একটু ছিট ছিল। এ-কথাটা আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম, বৈজ্ঞানিকদের অমন হয়েই থাকে। কিন্তু তবুও আমার একটু আশ্চর্য লাগল। কেউ যা পড়তে পারেনি তেমন দুষ্প্রাপ্য কোন প্রাচীন পুঁথি ছাড়া ছোটকাকার কাছে অন্য কিছুর কদর ছিল না।

আমাকে দেখেই ছোটকাকা বলে উঠলেন, 'কথায় বলে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। কথাটা খাঁটি। সেই ইহুদি বুড়োর দোকান হাতড়ে আজ এই রত্নটা উদ্ধার করেছি। আহা কি বই! দেখ্ বাঁধাইটাও কি দারুণ! এত পুরানো, তবু কি মজবুত এখনও! জানিস, কত পুরানো

বইটা? কমপক্ষে সাতশো বছরের। অথচ চেহারা দ্যাখ্! একদম নতুনের মত লাগছে না? এমন বাইন্ডিং, দেখলে বড় বড় দপ্তরীরা পর্যন্ত চোখ তুলে ফেলবে কপালে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কি বইটার?'

'নাম?' তেমনি উত্তেজিত গলায় বললেন ছোটকাকা, 'নাম হিমস ক্রিলো। বারো শতকের পণ্ডিত টার্লেশনের লেখা এ বই।'

'জার্মান তর্জমা কে করেছে?'

'তর্জমা! তর্জমা হতে যাবে কেন! এ তো সেই আসল বই—আইসল্যান্ডের ভাষায় লেখা। কি সুন্দর ভাষা! আর কি সাবলীল! ঠিক যেন জার্মান বই।'

'ছাপা কেমন? হরফগুলো দেখতে খুব সুন্দর নিশ্চয়ই?'

'ছাপা!' ভূত দেখলেন যেন ছোটকাকা, 'ছাপা? বলিস কি তুই? এ তো পাণ্ডুলিপি, হাতে লেখা পুঁথি—রুনিক হরফে লেখা।'

'রুনিক?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'সেটা আবার কি?'

ব্যস। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিলেন ছোটকাকা। অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটা সহ্য করতে হলো। শেষে বললেন: 'সেকালে এই রুনিক হরফই প্রচলিত ছিল আইসল্যান্ডে। সেদেশের লোকের ধারণা, দেবতা ওডিন নাকি নিজে এই বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন।'

বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন ছোটকাকা, হঠাৎ বইটার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা বিবর্ণ হলদে কাগজ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তক্ষুণি ছোটকাকা মহাআগ্রহে তুলে নিলেন সেটা। খুব সাবধানে কাগজটার ভাঁজ খুলে মেলে ধরলেন টেবিলের ওপব। কাগজটা লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, চওড়ায় ইঞ্চি তিনেক। হিজিবিজি হরফে কি সব লেখা। কিন্তু লেখাগুলো যে কি, মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কিচ্ছু।

ততক্ষণে দারুণ উৎসাহে কাগজটার পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ছোটকাকা। নির্বিকার ভাবে দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে চোখ ফেরালাম আমি। কিন্তু খানিকপরই শুনতে পেলাম ছোটকাকার গলা, 'লেখাগুলো রুনিক হরফেই। কিন্তু কি যে লেখা, তা তো বুঝতে পারছি না!'

দুনিয়ার সব ভাষা যাঁর দখলে, তাঁর মুখে এমন কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও ঢের বাকি। ক্রমশ তাঁর চোখে-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠল। পরিষ্কার বুঝলাম লেখাটার কোন মানেই উনি বের করতে পারছেন না। সেদিনই প্রথম খাবার ব্যাপারে অবহেলা দেখালেন তিনি, মার্থা এসে খাওয়ার কথা বলতেই 'নিকুচি করেছে খাবারের' বলে তাড়া লাগালেন। আমি অবিশ্যি অবহেলা করলাম না। গোগ্রাসে গিলে এলাম গিয়ে। বলা বাহুল্য, ছোটকাকার অংশটাও সাবাড় করলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে এলাম পড়ার ঘরে। ভুরু কুঁচকে আপন মনে বিড় বিড় করছেন ছোটকাকা, 'হরফগুলো যে রুনিক, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু মানে বোঝা যাচ্ছে না কেন? কি গোপন সঙ্কেতে লেখা কাগজটা? ওহ্? শুধু যদি সঙ্কেতটা বুঝতে পারতাম।'

হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেলেন ছোটকাকা। তক্ষুণি একটা চেয়ার

দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন। মুখে বললেন, 'যা বলি, সব একটা কাগজে টুকে নে তো! রুনিক বর্ণলিপির হরফে আমাদের হরফের যা মানে বোঝায়, কাগজটা দেখে তা বলে যাচ্ছি। সাবধানে লিখিস, ভুল করে ফেলিস না আবার।'

ছোটকাকার কথা শুনে শুনে লিখতে শুরু করলাম। শেষ হলে দেখলাম, অক্ষরগুলো এমন ভাবে বসেছে, মানে বের করা তো দূরের কথা কোন বাক্যই তৈরি হয় না এতে। লেখাগুলো এরকম:

m. rnlls	esrevel	Seeclde	sgtssmf
vnteief	niedrke	Kt.samn	atrate
saodrrn	emtuoel	uvaect	rrilSa
Atsaar	.nvcrc	ieaabs	ccdrmi
eevtVi	frAutv	dt,iac	oseibo
kediil			

ছোটকাকা কাগজটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলেন পাঠোদ্ধারের। নিজের মনেই বিড় বিড় করতে লাগলেন, 'মানে কি এর? নিঃসন্দেহে ক্রিপ্টোগ্রাফ! যদি কোনমতে অক্ষরগুলো ঠিকভাবে সাজানো যায়, তাহলেই কিস্তিমাত! কিন্তু...'

বইটা আর কাগজটা মিলিয়ে দেখতে শুরু করলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলেন কিছু। তারপর বললেন, 'হুঁ, যা ভেবেছি তাই। কাগজ আর পুঁথি দু'হাতের লেখা, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । পুঁথিটার অনেক-অনেক বছর পরে কাগজটা লেখা হয়েছে। চিরকুটটার প্রথম রয়েছে ইংরেজি জোড়া হরফ—টার্লেশনের বইয়ে এমন কোন হরফই নেই। প্রথম এই হরফটা ব্যবহার করা হয় চোদ্দ শতকে—তার মানে, চিরকুটটা ওই পুঁথিটার অন্তত দু'শো বছর পরে লেখা। কিন্তু কে সেই লোক? কার কাছে ছিল এই পুঁথি?' পাতা উল্টাতে উল্টাতে জানালেন তিনি: 'নাহ, পাওয়া যাচ্ছে না তার নাম!'

বইটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন ছোটকাকা, যদি কারও নাম পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া গেল না। সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার লোক ছিলেন না তিনি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বইটার পাতাগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। প্রথম পাতার এক কোণে অস্পষ্ট একটু কালির দাগ দেখা গেল। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর বোঝা গেল কালির দাগটা কতকগুলো আবছা হয়ে যাওয়া অক্ষরের সমষ্টি। দেখতে দেখতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, এ যে আর্‌ন্‌ সাক্‌ন্যুউজমের নাম! উনি তো ছিলেন আইসল্যান্ডের মস্ত বিজ্ঞানী! রসায়নে আজও জুড়ি নেই তাঁর। শোনা যায়, আলকেমির গবেষণাতেও সাফল্য লাভ করেছিলেন তিনি। সাক্‌ন্যুউজম নতুন কোন জিনিস আবিষ্কার করে সঙ্কেতে লিখে গেছেন হয়তো কাগজটায়। কিন্তু কি ধরনের সঙ্কেতে এটাই তো বুঝতে পারছি না ।'

'কিন্তু, ছোটকাকা, সাক্‌ন্যুউজম যদি নতুন কিছু আবিষ্কার ক'রই থাকেন, তবে এমন রহস্যময় সঙ্কেত ব্যবহার করবেন কেন?'

'কারণ একটা নিশ্চয়ই ছিল।' জানালেন ছোটকাকা, 'গ্যালিলিও নতুন গ্রহ আবিষ্কার করার পর এমনি ভাবেই সঙ্কেত-লিপিতে সমস্ত তথ্য লুকিয়ে রেখে গেছেন। কিন্তু কাগজটায় লেখা সঙ্কেতের মানে আমাকে বের করতেই হবে। এর

অর্থ বের না করা পর্যন্ত অন্য সব কাজ বন্ধ। বুঝলি, অ্যাকজেল, এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই বিদঘুটে হরফগুলোর মানে উদ্ধার করা।'

ভাল ছেলের মত ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। বুঝতে পারছি পুরোদস্তুর খেপে গেছেন ছোটকাকা। আর রেহাই নেই। আহার নিদ্রা সব একেবারে বাতিল। বারোটা বাজতে চলেছে আমার।

একটানা বলেই চললেন ছোটকাকা, 'কাজটা অবিশ্যি পানির মত সোজা। কাগজটায় একশো বত্রিশটা অক্ষর আছে, তার মধ্যে সাতাত্তরটা ব্যঞ্জনবর্ণ, বাকিগুলো স্বরবর্ণ। অনেক ভাষা জানতেন সাকন্যুউজম—মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। সঙ্কেতটা তিনি মাতৃভাষায় না লিখে ল্যাটিনেই লিখে রেখে গেছেন মনে হচ্ছে, কারণ সেকালে ল্যাটিনই ছিল বড় বড় পণ্ডিতদের ভাষা। কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার হলো, হরফগুলো ওলট-পালট করে সাজানো হয়েছে। কি ভাবে সাজানো হয়েছে, তার ধরনটা বুঝতে না পারলেই সব মাটি। ঠিক কি নিয়মে যে সাজানো হয়েছে...' হঠাৎ ভুরু কুঁচকালেন তিনি, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, সাকন্যুউজম লাইনগুলো সোজা না লিখে উপর থেকে নিচের দিকে লিখে গেছেন? এই নিয়মেও তো অনেকে সঙ্কেত লিপি লেখে।'

সায় দিয়ে বললাম, 'তা লেখে বৈকি।'

'তাহলে চট পট দেখা যাক কি লিখেছেন সাকন্যুউজম।' এই বলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিরকুটটা পড়তে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর হরফগুলো এভাবে সাজালেন: messvnka senrA ice fdok, seg nitt. amvrtn.

'নাহ্, কিচ্ছু হলো না!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'এভাবে লিখলেও তো কোন মানে হয় না।' হঠাৎ এক লাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে হুড়মুড় করে নিচে নেমে সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলেন ছোটকাকা, যেন বিদ্যুৎ বেগে পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে পড়ল নিচে। ব্যাপার দেখে আমি তো একেবারে থ।

ছোটকাকাকে এভাবে হঠাৎ বেরিয়ে যেতে দেখে মার্থাও অবাক। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'না খেয়েই যে বেরিয়ে গেলেন উনি?'

'খাওয়া বোধ হয় আজ ওঁর কপালে নেই।'

আশ্চর্য হলো মার্থা, 'মানে? রাত্তিরেও খাবেন না?'

'মনে তো হচ্ছে না।'

মার্থা চলে যেতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করলাম আমি। ছোটকাকার স্বভাব ভাল মতই জানতাম। ওই হেঁয়ালির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আহার-নিদ্রা সব বন্ধ। ওঁর সাথে সাথে আমাদেরও।

হঠাৎ ভাবলাম, কাগজটা একবার নেড়ে-চেড়ে দেখলে কেমন হয়। ভাগ্য ভাল হলে পেয়েও যেতে পারি কিছু। কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। মনে মনে নানাভাবে সাজালাম অক্ষরগুলো । হলো না। বাধ্য হয়ে ছোটকাকা যে কাগজটায় হরফ সাজিয়েছেন সেটা তুলে নিলাম। দু'জায়গায় দুটো ইংরেজি শব্দ দেখলাম—Sir আর ice। এছাড়া কয়েকটা লাতিন শব্দ—rota, mutalsile, ira, nec, atra, Luco, একটা হিব্রু শব্দ—talsiled এমন কি গোটা তিনেক

ফরাসী শব্দ—mer, are, mire-ও পেলাম।

মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো। ইংরেজি, ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসী—চার-চারটে ভাষা! পরিষ্কার বুঝলাম এই বিদঘুটে সঙ্কেত লিপির মানে বের করা আমার কম্মো নয়। কি মানে হয় বরফ, মশাই, রাগ, নিষ্ঠুর, পবিত্র, অরণ্য, পরিবর্তনশীল, মা, ধনুক, সমুদ্র এসব শব্দের? বরফ আর সমুদ্র এ দুটো শব্দ অবশ্য আইসল্যান্ডের কেউ লিখলে ততটা বেমানান নয়, কিন্তু বাকিগুলো?

সাক্‌ন্যুউজমের সঙ্কেত লিপিটার দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝে গেলাম গোটা ব্যাপারটা। শেষ লাইনের শেষ হরফ থেকে শুরু করে উল্টোভাবে পড়ে এলেই, মানে meretarc কে craterem পড়লেই উদঘাটন হয়ে যায় এই সঙ্কেত রহস্যের। কিন্তু সঙ্কেতটা পড়েই শিউরে উঠলাম। এই রহস্য জেনে গেলে ছোটকাকাকে কোনমতেই আর ঘরে আটকে রাখা যাবে না।

মনে মনে স্থির করলাম নষ্ট করে ফেলতে হবে কাগজটা। কিন্তু ফেলতে হবে বললেই তো আর ফেলা যায় না। ওটা চুল্লিতে ফেলতে যাচ্ছি, ঠিক এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন ছোটকাকা। চেহারা দেখে বোঝা গেল, বাইরে গিয়েও মুহূর্তের জন্যে স্বস্তি পাননি—কাগজের টুকরোটা ওঁকে ভূতের মত তাড়া করে ফিরেছে।

আবার কাগজ কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলেন ছোটকাকা। একটু লিখেই ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কাটতে থাকেন। আতঙ্কিত ভাবে চেয়ে থাকলাম সেদিকে। যে-কোন মুহূর্তে বের করে ফেলতে পারেন রহস্যটা। আর তাহলেই হয়েছে।

কাগজের একশো বত্রিশটা অক্ষরকে অসংখ্যভাবে সাজানো যায়। কতভাবে আর সাজাবেন ছোটকাকা? আসল নিয়মটা বের করতে না পারলে চিরকাল এই গোলক ধাঁধায় পথ হাতড়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু তবু আশঙ্কাটা গেল না মন থেকে।

সময় কেটে গেল। দিন গড়িয়ে সাঁঝ হলো, সাঁঝ থেকে রাত। ক্রমে গভীর হলো সে রাত। কমতে কমতে এক সময় থেমে গেল পথঘাটের শোরগোল, কিন্তু তবু হুঁশ ফিরল না ছোটকাকার। একমনে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়েই চলেছেন তিনি।

মাঝে একবার উঁকি দিয়ে জানিয়েছিল মার্থা, খাবার তৈরি। কিন্তু কার কি! কথাটা শুনতেই যেন পাননি ছোটকাকা। শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছে মার্থা।

নিরুপায় বসে রইলাম আমি। তারপর কখন যে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না। ভোরবেলা জানালা দিয়ে রোদ এসে চোখেমুখে লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চেয়ে দেখি, ছোটকাকা ঘাড় গুঁজে তখনও হরফ সাজিয়ে চলেছেন। এলোমেলো চুলগুলো এসে পড়েছে চোখেমুখে। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। ওঁর অবস্থা দেখে মনে মনে দুঃখ হলো। কিন্তু কি করব? বলে দেব, সঙ্কেতের রহস্যটা আমি বের করতে পেরেছি? কিন্তু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মরণের দিকে রওনা দেবেন উনি। না বললেও এমন প্রচণ্ড মানসিক শ্রমে কিছু একটা বিপদ আপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বের করতে পেরেছ, ছোটকাকা?'

চমকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন উনি। ওঁর চোখ দুটো দেখে শিউরে উঠলাম। টকটকে জবা ফুলের মত লাল। এরপর আর চুপ থাকার কোন মানে হয়

না। বলে ফেললাম, 'আমি কিন্তু পেরেছি।'

চেঁচিয়ে উঠলেন ছোটকাকা, 'পেরেছিস? মানেটা বের করতে পেরেছিস?'

'হ্যাঁ,' জানিয়ে দিলাম সঙ্কেতটা, 'যদি শেষ হরফ থেকে উল্টো দিকে পড়তে থাকো তাহলে তুমিও পারবে।'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই টেবিল থেকে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিলেন ছোটকাকা। মুহূর্তে বদলে গেল ওঁর চেহারা। শব্দ করে পড়তে শুরু করলেন:

'In Sneffels Joculis craterem quem delibat, Umbra Scartaris Julii intra calendas descende, Audax viator. et terrestre centrum attinges Quod feci, Arne Saknussemm.'

ভাষাটা ল্যাটিন। মানে করলে হয়:

'হে নির্ভীক পথিক! জুলাই মাসের গোড়ার দিকে যখন স্কার্টারিস পর্বত চূড়ার ছায়া পড়বে স্নেফেল আগ্নেয়গিরির মুখের উপর, তখন সে পথে নেমে গেলে তুমি পৌঁছে যাবে পৃথিবীর অন্তঃপুরে। আমি সে পথে গিয়েছিলাম—আর্‌ন্‌ সাক্‌ন্যুউজম।'

পড়া শেষ করে উল্লাসে নাচতে শুরু করলেন ছোটকাকা। হঠাৎ কি মনে হতে ধপ করে চেয়ারে বসেই নিস্তেজ গলায় জানতে চাইলেন, 'কটা বাজে?'

'দুটো।'

'দুটো, অ্যাঁ! তাই তো বলি, খিদেয় জ্বলছে কেন পেট? ইশ্‌! এত বেলা হয়ে গেছে! চল্‌ চল্‌, শিগ্‌গির খেয়ে নি। মেলা কাজ পড়ে আছে। মালপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে আবার।'

'সে কি! কিসের মালপত্র?'

'শুধু আমার না, তোরও,' বলেই ডাইনিংরুমের দিকে জোরে পা চালিয়ে দিলেন ছোটকাকা।

দুই

একেই বলে কপাল। যে ভয় করছিলাম, তাই-ই হলো। অবশ্য খুব একটা উদ্বিগ্ন হলাম না তবু। বললেই তো আর পৃথিবীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায় না। বুঝিয়ে বললে হয়তো ছোটকাকা ওসব আজগুবি চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতেও পারেন।

ডাইনিংরুমে ঢুকে দেখলাম পাহাড় প্রমাণ খাবার নিয়ে বসেছেন ছোটকাকা। এমনিতেও একটু পেটুক উনি। তার উপর কাল সারাদিন খাওয়া হয়নি। সেটাই যেন সুদে আসলে আজ আদায় করে নেয়ার ইচ্ছে।

খাওয়ার পাট চুকলে আমাকে নিয়ে ছোটকাকা আবার পড়ার ঘরে ঢুকলেন। আয়েশ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'অ্যাকজেল, আমার কি উপকার যে তুই করেছিস বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু সাবধান, ঘুণাক্ষরেও যেন একথা কেউ

জানতে না পারে।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'তোমার কি মনে হয় লোকে একথা বিশ্বাস করবে?'

'সকলের কথা জানি না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানীর কানে একথা পৌছুলে তখনি ছুট লাগাবে আইসল্যান্ডের দিকে, এতে সন্দেহ নেই।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সাক্‌ন্যুউজমের কথা যে সত্যি তার ঠিক কি?'

কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ছোটকাকা। 'কি বলতে চাস তুই? মিছে কথা লিখে গেছেন সাক্‌ন্যুউজম? তোর মত বেহদ্দ বেকুব তো আর ছিলেন না তিনি। পিটার্মানের কাছ থেকে যে ম্যাপটা পেয়েছি, নিয়ে আয়। সব দেখাচ্ছি তোকে।'

ম্যাপটা টেবিলে বিছিয়ে জ্ঞান দান করে চললেন ছোটকাকা, 'আইসল্যান্ডের সবচে ভাল ম্যাপ এটা, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখানো হয়েছে। এই যে আগ্নেয়গিরিগুলো দেখছিস, ওদের বেশির ভাগই মরে গেছে এখন। আর এদিকটা আইসল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল, রাজধানী রিজকিয়াভিক। অসংখ্য পার্বত্য ঘাঁটি আছে এদিকটায়। এইটা হলো পঁয়ষট্টি ডিগ্রী অক্ষাংশ। এই যে ছোট্ট দ্বীপটা দেখছিস, বলতো দ্বীপটার এখানটায় কি? এই যে সমুদ্রের কোল থেকে শুরু হয়েছে?'

'পাহাড় একটা।'

'ঠিক। আর এই পাহাড়টাই স্নেফেল। চূড়াটা পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। এই চূড়ার উপরে স্কার্টারিস পর্বত চূড়ার ছায়া পড়লেই পাওয়া যাবে পৃথিবীর ভেতরে ঢোকার পথ।'

'অসম্ভব! আগ্নেয়গিরির ভেতরে হয়তো এখনও জ্বলন্ত অঙ্গার, ধাতু, লাভা—সব-সবই আছে। কি করে ঢুকবে?'

বাধা দিয়ে বললেন ছোটকাকা, 'পৃথিবীর বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরিই তো নিভে গেছে। এটাও যে নেভেনি তুই কি করে জানলি? বারোশো উনিশ সালে স্নেফেল শেষবারের মত অগ্ন্যুদ্গার করেছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত একদম চুপ।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'সাক্‌ন্যুউজম কত সাবধান হয়ে সঙ্কেতটা লিখে গেছেন, এখনও মাথায় ঢুকল না তোর? স্নেফেলের অনেকগুলো জ্বালামুখ। যে জ্বালামুখটা দিয়ে ঢুকলে একেবারে পাতালে পৌছানো যাবে, সেটা বোঝানোর জন্যেই জুলাই মাসের কথা উল্লেখ করেছেন। সে সময়টায় স্কার্টারিস পর্বতচূড়ার ছায়া ঠিক সেই নির্দিষ্ট মুখের উপর পড়ে। এটা বেশ হিসেব করেই লিখে রেখে গেছেন তিনি। এরপরও অবিশ্বাস করবি তুই?'

'এমনও তো হতে পারে, লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ শুনেই কথাটা লিখে গেছেন তিনি? আইসল্যান্ডবাসীদের হয়তো ধারণা ছিল, এই পাহাড়ের মুখ দিয়ে একেবারে পৃথিবীর মাঝখানে গিয়ে পৌছানো যায়, প্রায় দেশেই তো এমন বিদঘুটে সব প্রাচীন প্রবাদ আর কেচ্ছা শোনা যায়। এটাও হয়তো তেমন একটা কিছু!'

রেগে গেলেন ছোটকাকা, 'আর কিছু বলার আছে তোর?'

'আছে,' বললাম আমি, 'পৃথিবীর ভেতরে যে যাওয়া অসম্ভব, বিজ্ঞান সে কথা জোর দিয়ে বলে। বৈজ্ঞানিকদের কথানুযায়ী পাতালে অসহ্য উত্তাপ, সে উত্তাপে কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। পৃথিবীর নিচে প্রতি সত্তর ফুট অন্তর এক ডিগ্রী

করে তাপমাত্রা বেশি। সেই হিসাবে পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রস্থলের উত্তাপ দাঁড়ায় তিন লক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রীর কাছাকাছি। জায়গাটা গ্যাসে ভরা।'

'তাহলে তোর আপত্তির কারণ হচ্ছে সাংঘাতিক উত্তাপ?'

জোর গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই! বিজ্ঞান একথাও বলে, পৃথিবীর ত্রিশ মাইল নিচ পর্যন্ত মাটি, বালি আর কাদা। এর পরই শুধু জ্বলন্ত তরল পদার্থ।'

এবার পুরোপুরি খেপে গেলেন ছোটকাকা, 'খামোকা কি আর বলে—অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী! পৃথিবীর নিচে কি হচ্ছে না হচ্ছে কেউই বলতে পারে না, সব আন্দাজের ব্যাপার। বিজ্ঞান তো এখনও শিশু! সে আজ যে কথা বলে, কালই বলে ঠিক তার উল্টো। মস্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক পোঅঁসের নাম শুনেছিস? কি বলেছেন উনি? বলেছেন, পৃথিবীর নিচে তিন লক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রী উত্তাপ থাকলে ওই ভয়ঙ্কর উত্তাপ ভেতরে আটকে রাখার ক্ষমতা উপরের ত্রিশ মাইল মাটির মোটেই থাকত না—কবেই ভেঙে চুরে গুঁড়ো হয়ে যেত। আর শুধু পোঅঁস কেন, আরও অনেকেই সে কথায় সায় দিয়েছেন। পৃথিবীর ভেতরে যে গ্যাস বা আগুন নেই সেকথা সবাই জানে। হাজার হাজার বছর আগে যে সব আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্গার করত, তাদের বেশির ভাগই মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার মানে কি এই নয় যে পৃথিবীর ভেতরটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে? এ নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করব না, ক'দিন পরই প্রমাণ হয়ে যাবে পৃথিবীর ভেতরটা এখনও তরল আছে কিনা, এ নিয়ে আঠারোশো পঁচিশ সালে স্যার হামফ্রি ডেভির সঙ্গে আমার তর্ক বেধেছিল। শেষে মীমাংসা হলো তরল থাকতেই পারে না।'

'কোন্ যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল?'

হাসলেন ছোটকাকা, 'অতি সহজ যুক্তিতে। পৃথিবীর তরল পদার্থ মাত্রই চাঁদের আকর্ষণের পাল্লায় পড়ে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তরল হলে নিশ্চয়ই দিনে দু'বার জোয়ারের মত ফুলে-ফেঁপে উঠত। তাতে দিনে নিয়মিত সময়ে দু'বার ভূমিকম্প হত।'

এরপর তর্ক করার মত আর কথা খুঁজে পেলাম না। তবুও মিনমিন করে বললাম, 'কিন্তু পাতালে যা অন্ধকার—'

'দূর বোকা! টর্চের কথা ভুলে গেছিস?'

শুকনো গলায় বললাম, 'তাহলে চেষ্টা করলে পৃথিবীর ভেতরে যাওয়া যাবে?'

'যাবেই তো। কি বোঝালাম তোকে এতক্ষণ ধরে?'

আর কথা না বলে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে ভাল লাগবে হয়তো। পথে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কিন্তু মনে হলো হ্যামবুর্গ শহরের কোথাও হাওয়া নেই একটুকুও।

ছোটকাকার কথায় পরিষ্কার হয়ে গেছে, পাতালে না গিয়ে ক্ষান্ত হবেন না উনি। অথচ সেখানে যাওয়া যাবে বলে বিশ্বাসই হচ্ছিল না আমার। যতই যুক্তি দেখান ছোটকাকা, পৃথিবীর ভেতরে টগ্‌বগ্ করে যে তরল আগুন ফুটছে না, এ হতেই পারে না। মানুষের পক্ষে কোন দিনও সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পর বাসায় ফিরে দেখলাম গ্রোবেন কি জন্যে হোস্টেল থেকে দিন

দুয়েকের ছুটি পেয়ে বাড়ি এসেছে। ওকে সব খুলে বললাম। চুপচাপ সব শুনল সে। তারপর বলল, 'এ তো সৌভাগ্যের কথা, অ্যাকজেল! ভয় কি? সম্ভব হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম। ইতিহাসে তোমাদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভাবতেও হিংসে হচ্ছে আমার।'

একেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা! যেমন বাপ, তেমনি তার বেটি। আর একটা কথাও না বলে নিজের ঘরে চলে এলাম। সারাটা রাত কাটল এলোমেলো চিন্তায়। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙল লোকজনের চেঁচামেচিতে। ছোটকাকা একাই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছেন, কাক চিল পর্যন্ত বসতে পারছে না বাড়ির ছাদে।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে আমার ঘরে ঢুকলেন তিনি। তখনও শুয়ে আছি দেখে তো রেগে কাঁই। চেঁচাতে শুরু করলেন, 'জলদি, জলদি ওঠ। চট্ পট্ জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। আমার কাগজপত্রগুলোও নিস কিন্তু।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কোনমতে চিঁচি করে বললাম, 'সত্যিই তাহলে যাচ্ছি আমরা?'

'ব্যাটা বলছে কি, অ্যাঁ! সত্যি না তো কি মিথ্যে? কালই রওনা হচ্ছি। শিগ্গির ওঠ্— ।' আমাকে আরও হতভম্ব করে দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক বাদে আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। এলাহি কাণ্ড সেখানে। বাক্স, পোর্টম্যান্টো, দড়ির মই, গিঁঠ দেয়া দড়ি, মশাল, বিশাল সব শিশি-বোতল, কুড়াল, গাঁইতি—সব ছড়ানো।

পিছন থেকে গ্রোবেন বলল, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি? বাবার সঙ্গে এইমাত্র আমার কথা হলো। যা বুঝলাম কাজটা মোটেই কঠিন নয়। আমার মন বলছে, সফল তোমরা হবেই।'

গ্রোবেনের দৃঢ় কণ্ঠ শুনে মনে একটু জোর পেলাম। ওকে সঙ্গে নিয়ে ছোটকাকার ঘরে ঢুকলাম। 'ছোটকাকা, যেতেই যদি হয় তো এত তাড়াহুড়ার দরকার কি? এখনও যথেষ্ট সময় আছে হাতে। মে মাস তো শুরুই হয়নি— ।'

'আইসল্যান্ড তো আর দু'দিনের পথ নয়,' উত্তর দিলেন ছোটকাকা, 'জুনের শেষে আমাদের স্নেফেলের চূড়ায় উঠতে হবে। জুলাই এর প্রথমে সে পয়লা জুলাইও হতে পারে, দোসরাও হতে পারে— আমাদের ক্রেটারের মধ্যে দিয়ে নিচে নামতে হবে। তাছাড়া এখুনি কোপেনহেগেনের জাহাজ অফিস থেকে আইসল্যান্ডের টিকেট কাটাতে হবে। কারণ, মাসে মাত্র একবার কোপেনহেগেন থেকে আইসল্যান্ডের জাহাজ ছাড়ে। এ মাসে সে তারিখটা বাইশে মে। হাতে মোটেই সময় নেই।'

বললাম, 'কিন্তু বাইশে জুন জাহাজে চড়লেও তো চলে?'

'না, চলে না,' একটু বিরক্ত হলেন ছোটকাকা, 'তাতে দেরি হয়ে যাবে বেশি। কারণ কখন যে স্কার্টারিস পর্বতচূড়ার ছায়া স্নেফেলের উপর পড়বে, ঠিক নেই। তার আগেই আমাদের সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। এ জন্যে কোপেনহেগেনে যত তাড়াতাড়ি পৌছানো যায় ততই ভাল।'

এরপর আর কথা চলে না। সারাটা দিন জিনিসপত্র গোছগাছ করতেই কাটল।

সন্ধ্যাবেলা ছোটকাকা জানালেন, পরদিন ভোর ছ'টায় আমাদের রওনা হতে হবে।

রাত দশটায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম কি আর সহজে আসে? রাত যত গভীর হলো ততই ভয়ের বোঝা চেপে বসতে লাগল। তন্দ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। আমি যেন ঘোর অন্ধকার পাতালে নেমেছি। চলতে চলতে এক সময় গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়েছি একটা বড় পাথরে, সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী ভেঙে পড়েছে মাথার ওপর। ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সকাল পাঁচটা।

হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে নিচে নেমে দেখি ছোটকাকা প্রাতরাশে বসেছেন। আমাকেও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বললেন। রওনা দেয়ার সময় হয়ে গেছে।

সাড়ে পাঁচটায় গেটের সামনে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালপত্র তোলা হলো গাড়িতে। তারপর গ্রোবেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর ছোটকাকা উঠে বসতেই গাড়িটা চলতে শুরু করল স্টেশনের দিকে।

তিন

সুন্দর শহর কোপেনহেগেন। বিশাল রাজপ্রাসাদের চারধারে পরিখা। সুন্দর একটা সেতু, পরিখা পারাপারের জন্যে। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে এই রাজপ্রাসাদ।

কোপেনহেগেনে এসে পৌছলাম বেলা দশটায়। স্টেশন থেকে মালপত্রগুলো ফিনিক্স হোটেলে পাঠিয়ে দিয়ে ছোটকাকা আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন মিউজিয়ামের দিকে।

শহরটা দেখতে দেখতে চললাম। এক্সচেঞ্জ অফিস বিল্ডিঙের গম্বুজটাকে মনে হলো অপূর্ব। চারটে সোনালী ড্রাগনের লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে তৈরি ওটা। সেদিকে খেয়ালই করলেন না ছোটকাকা। একটু দূরে আকাশ ছোঁয়া গির্জার চূড়াটা দেখা যাচ্ছে, সেদিকেই নিয়ে চললেন আমাকে।

গির্জার চূড়াটা এত উঁচু, মনে হলো আকাশের মেঘ ওটার গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। চূড়ায় ওঠার সিঁড়িটা গির্জার গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

ছোটকাকা যখন এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার প্রস্তাব দিলেন, আঁতকে উঠলাম আমি। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না ছোটকাকার। বললেন, 'চল্, উঁচুতে ওঠার অভ্যাস করতে হবে আমাদের।'

সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ালাম আমি। পেছন থেকে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আমার পিঠে খোঁচা মারলেন ছোটকাকা। যতক্ষণ সিঁড়িটা ভেতর দিয়ে উঠেছে সহজেই উঠতে পারলাম। প্রায় দেড়শো ধাপ পেরোবার পর খোলা জায়গায় এসে পৌছলাম। এখান থেকে সিঁড়িগুলো সোজা গম্বুজের চূড়া অবধি উঠে গেছে।

কোনমতে রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। দামাল হাওয়া ছুঁয়ে গেল শরীর। এতে ভয় পেয়ে গেলাম আরও। মনে হলো হাওয়ায় থরথর কাঁপছে গির্জা.

আর টলমল করে দুলছে তার চূড়াটা। একটু উঠেই মাথা ঘুরে গেল, আর দাঁড়াতে পারলাম না। ধপ করে বসে পড়লাম সিঁড়ির উপরেই।

কড়া এক ধমক লাগালেন ছোটকাকা। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মুখে ধমক মারলেও চোখ দুটো হাসছে। আমার এই করুণ অবস্থায় মনে মনে দারুণ মজা পাচ্ছেন উনি। আরেকবার ধমক মারতেই উঠে দাঁড়ালাম। শেষ পর্যন্ত চূড়ায় পৌঁছেও নিস্তার পেলাম না। নির্দেশ দিলেন তিনি, 'সাহস করে নিচের দিকে দ্যাখ্ তো এবার। আরে, অত ভয় পাচ্ছিস কেন? পাহাড়ের চূড়া থেকে পাতালের গহবরের দিকে তাকাতে হবে না? এখন থেকেই তো সব অভ্যাস করে নিতে হবে!'

ভয়ে ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘর-বাড়ি সব যেন ধোঁয়ার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে। পুতুল রাজ্যের মত ছোট ছোট সব ঘর-বাড়ি, পিঁপড়ের মত সারি সারি চলমান জনস্রোত। এত উঁচুতে উঠেছি যে মনে হলো আকাশে মেঘের ভেলাগুলো স্থির নিষ্কম্প, শুধু চূড়া সহ আমিই ঘুরছি বোঁ বোঁ করে। দূর দিগন্তের একদিকে বনের সবুজ আর আকাশের নীল মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, অন্যদিকে কল্লোলিত সুনীল সাগর। সবই যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে লাটিমের মত।

শির শির করে উঠল শরীর। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। তবু ছোটকাকার আদেশে পুরো একটি ঘণ্টা কাটাতে হলো ওখানে, গির্জার চূড়া থেকে যখন নেমে এলাম ব্যথায় তখন টন টন করছে পা দুটো।

জাহাজ অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের জাহাজ ছাড়তে আরও পাঁচদিন বাকি। ভেবেছিলাম এ পাঁচটা দিন বিশ্রাম নেয়া যাবে। কিন্তু রেহাই দিলেন না ছোটকাকা। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন মহড়ায়। মানে পাঁচ দিনই উঠতে হলো আমাকে গির্জার চূড়ায়। শেষে অবশ্য দেখলাম যথেষ্ট কাজ হয়েছে এতে। প্রথম দিনের চেয়ে পঞ্চম দিনে চূড়ায় ওঠার সাহস আর মনের জোর অনেকখানি বেড়ে গেল আমার।

পাঁচ দিন পর 'ভাদকিরিয়া' জাহাজে উঠলাম। ছোটকাকা জাহাজে উঠেই এক কাণ্ড করে বসলেন। খুশির চোটে তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এত জোরে করমর্দন করলেন যে বেচারা ক্যাপ্টেনকে বেশ কয়েকদিন কব্জির ব্যথায় ভুগতে হয়েছিল। ছোটকাকার এই কাণ্ডে ক্যাপ্টেন একটু আশ্চর্য হলেও আমি হইনি। আইসল্যান্ডে যাওয়ার আনন্দে ছোটকাকা যে এমনি একটা কিছু করে বসবেন তা আগেই আন্দাজ করেছিলাম আমি।

এগারো দিন পর আইসল্যান্ডের রাজধানী রিজকিয়াভিকে পৌঁছলাম। জেটিতে দাঁড়িয়েই আঙুল তুলে ছোটকাকা আমাকে স্নেফেল দেখালেন। বরফে মোড়া পাহাড় চূড়াটা যেন আকাশের মেঘ ভেদ করে মহাশূন্যে গর্বিত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

আগের ব্যবস্থা মত আমরা রিজকিয়াভিকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রিদিকসনের অতিথি হলাম। ফ্রিদিকসনের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ছোটকাকা সাক্‌নুউজমের লেখা কোন পুঁথি পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজতে লাইব্রেরির উদ্দেশে বেরোলেন। আমি বেরোলাম শহর ঘুরে দেখতে।

ছোট্ট শহর, মাত্র দুটো রাজপথ। একটুও ভাল লাগল না শহরটা। যতদূর চোখ যায় শুধু আগ্নেয়গিরির মাথা। হয়তো এ জন্যেই ভাল লাগল না আমার। ওইগুলোর

একটা থেকেই তো শুরু হবে আমাদের পাতাল অভিযান।

অনেকক্ষণ ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। দুই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে তখন জোর আলোচনা চলছে। ছোটকাকা সতর্কভাবে আমাদের আইসল্যান্ডে আসার উদ্দেশ্য গোপন রাখার চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ জানতে চাইলেন ছোটকাকা, 'আর্‌ন্‌ সাক্‌ন্যুউজমের লেখা কোন বই আছে আপনার লাইব্রেরিতে?'

গর্বিত সুরে বললেন ফ্রিদিকসন, 'যে কোন ধাতুকে সোনায় পরিণত করার বিদ্যা ছিল যাঁর হাতের মুঠোয়, ষোলো শতকের সেই অসামান্য প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের কথা বলছেন তো? আইসল্যান্ডের গৌরব উনি। এদেশের বিজ্ঞান আর সাহিত্যে সম্রাট। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বজনের শ্রদ্ধেয় ওই লোক।'

আশান্বিত হয়ে ছোটকাকা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তাঁর বইই দেখতে চাইছি।'

আফসোস করে বললেন ফ্রিদিকসন, 'কিন্তু এখানে তো ওঁর বই পাবেন না। আর শুধু এখানে কেন, দুনিয়ার কোথাও পাবেন না। নাস্তিক বলে পনেরোশো তিয়াত্তর সালে ওঁকে ভয়ঙ্কর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল এ দেশেরই লোকের হাতে। সারা পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে কোপেনহেগেনে তখন ওঁর সব বইই পুড়িয়ে ফেলা হয়।'

আপন মনেই ছোটকাকা বিড় বিড় করলেন, 'হুঁ। এখন বোঝা যাচ্ছে কেন তিনি হেঁয়ালির মাঝে অতবড় আবিষ্কারের কথাটা লিখে রেখে গেছেন।'

কথাটা শুনেই অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন ফ্রিদিকসন, 'হেঁয়ালি! আবিষ্কার! মানে—আপনি ওঁর কোন গোপন লিপি পেয়ে গেছেন?'

প্রায় ফাঁস করে ফেলেছেন ভেবে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন ছোটকাকা। আমতা আমতা করে বললেন, 'না না, আমি পাব কোত্থেকে? ও একটা অনুমান মাত্র।'

'অনুমান? ওহ্‌, তাই বলুন।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ছোটকাকা। বললেন, 'আইসল্যান্ডে আসতে বোধ হয় আমার দেরি হয়ে গেল। আমার আগে হয়তো অনেকেই এখানে সব দেখে শুনে গেছেন, তাই না?'

'তাতে কি হয়েছে?' সান্ত্বনার সুরে বললেন ফ্রিদিকসন, 'ভূতত্ত্বের দেশ এই আইসল্যান্ড। এখানে অনেক কিছুই দেখার আছে, জানার আছে। কত অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি আর হিমশৈল আছে কে তার খোঁজ রাখে? বেশি দূর যাবার দরকার কি? ওই যে স্নেফেল পর্বত, ওর মত আশ্চর্য অগ্নিগিরি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। অবশ্য পাঁচশো বছর আগেই নিভে গেছে ওটা।'

'তাই নাকি?' বিপুল আনন্দ কোনমতে চেপে রেখে বললেন ছোটকাকা, 'আমি তাহলে ওই স্নেফেলেই যাব। কি করে যাওয়া যায় বলুন তো?'

'স্থল পথে,' বললেন ফ্রিদিকসন, 'পথ অবশ্য খুব সোজা—সাগরের তীর ধরে নাক বরাবর চলে গেলেই হলো।'

'কিন্তু এখানকার পথ ঘাট তো জানা নেই আমার। একজন গাইড পাওয়া যাবে?'

'গাইডের জন্যে ভাবনা নেই। একটা লোক আছে আমার চেনা, ওকে বলে দিলেই হবে। ঠিক যেখানটায় যেতে চাইবেন নিয়ে যাবে। বেশ চালাক-চতুর আর খুবই বিশ্বাসী লোক।'

ফ্রিদিকসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন ছোটকাকা, 'ওর সঙ্গে এখুনি আলাপ করে নেয়া যায় না?'

'না। আজ পাওয়া যাবে না ওকে। কোথায় কি একটা কাজে গেছে। কাল ভোরে ফিরবে। তখনই কথা বলা যাবে।'

এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা বিন্দুমাত্র ফাঁস না করে সব ব্যবস্থা যে করে নিতে পারবেন ছোটকাকা, ভাবতে পারিনি।

চার

ঘুম ভাঙল ছোটকাকার চেঁচামেচিতে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। চোখে মুখে এসে পড়েছে কড়া রোদ। বিছানায় শুয়েই শুনতে পেলাম ছোটকাকা কার সঙ্গে যেন ঝড়ের বেগে কথা বলে চলেছেন।

কথা হচ্ছিল দিনেমার ভাষায়। লম্বা, চওড়া, স্বাস্থ্যবান, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত এক লোকের সাথে কথা বলছিলেন ছোটকাকা। অল্পক্ষণেই বুঝলাম সে গম্ভীর এবং স্বল্পবাক— কাজের কথা ছাড়া একটিও বাজে কথা বলে না।

আইসল্যান্ডবাসী সেই লোকটি চওড়া বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দু'হাত রেখে চুপচাপ ছোটকাকার কথা শুনছিল। ওর নাম হান্‌স্ বিলকে। আইসল্যান্ডের এমন জায়গা নেই যা সে ঘুরতে বাকি রেখেছে। সে-ই আমাদের গাইড। পারিশ্রমিকটা প্রথমেই ঠিক করে নেয়া হলো। এখান থেকে একশো চুরাশি মাইল দূরে, স্নেফেলের পাদদেশে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম স্ট্যাপি পর্যন্ত সে যাবে আমাদের সঙ্গে।

ফ্রিদিকসন চারটে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি ছোটকাকার, একটি আমার আর বাকি দুটো মালপত্র বয়ে নেয়ার জন্যে। হান্‌স্ যাবে হেঁটে।

পথ ঘাট সব ওর নখদর্পণে। অসংখ্যবার সে এ পথে যাতায়াত করেছে। কথাটা শুনে ছোটকাকা নতুন চুক্তি করে নিলেন ওর সঙ্গে। শুধু স্ট্যাপি পর্যন্তই নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে আমরা যতদূর যাব হানস্‌ও যাবে। ওর বেতন সপ্তাহে বারো শিলিং করে। হান্‌স্ শুধু বলল, আমাদের যাই হোক না কেন, প্রতি শনিবারে সাপ্তাহিক মাইনে চুকিয়ে দেয়া না হলে সে তক্ষুণি চাকরি ছেড়ে দেবে।

যাত্রার সময় হয়ে এল। গাঁইতি, কুড়াল, রেশমের দড়ি, দড়ির সিঁড়ি, হাতুড়ি, পেরেক, যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম পর্যন্ত সবকিছু গুছিয়ে নেয়া হলো। গুলি, বারুদ আর ছোটকাকার দেশলাই, চুরুট কিছুই বাদ গেল না। কয়েকজোড়া ভাল রাবারের জুতা, আর ছ'মাসের উপযোগী রসদ নেয়া হলো সঙ্গে।

আজ ষোলোই জুন। আকাশ মেঘলা, কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। কেমন যেন বিষণ্ণ দিনটা। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে রওনা দিলাম আমরা।

রিজকিয়াভিক ছাড়িয়ে এলাম একসময়। সাগরের তীর ধরে সামনে চলতে থাকলাম। কখনও এক আধটা পাহাড় পানির ধার থেকে খাড়া উঠে গেছে। সে সব ক্ষেত্রে আমাদের ঘুরে যেতে হচ্ছিল।

যেতে যেতে আইসল্যান্ডের ঘোড়া সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন ছোটকাকা। এখানকার ঘোড়ার মত সুন্দর ঘোড়া নাকি পৃথিবীর কোথাও নাই। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি পরিশ্রমী। পথ চলতে গিয়ে কোন বাধাই এরা মানে না। বরফ পড়ুক, তুফান উঠুক, পাহাড় পর্বত, নদীনালা যা কিছু সামনে পড়ুক না কেন বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে চলে যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হানস প্রতিদিন মাইলের পর মাইল হাঁটবে কি করে ভেবে অবাক হলাম।

ছোটকাকাকে কথাটা বলতেই বললেন, 'ওর কথা ভাবিস না। হেঁটেই আমাদের চেয়ে সে ভাল চলতে পারবে। সহজে ক্লান্ত হওয়ার লোকই নয় ও। আর যদি তেমন ক্লান্ত হয়ই তাহলে আমার ঘোড়ায় এসে উঠতে পারবে। একটানা ঘোড়ায় চড়ে যেতে আমারও ভাল লাগবে না।'

একটা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললাম আমরা। জায়গাটা মরুভূমির মত, পরিত্যক্ত। দূরে এক আধটা ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি চোখে পড়ছিল কখনও কখনও।

ঘণ্টা দুয়েক পর নাশতা সেরে আবার চলতে শুরু করলাম। এবার পথ গেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে। বিচ্ছিরি পথ। কবে কোন্ অতীতে আগ্নেয়গিরির লাভা এখানে এসে পড়েছিল—এখন তা জমে কঠিন হয়ে গেছে। অসমতল ঢেউ খেলানো রাস্তা দেখে সহজেই তা অনুমান করা যায়।

বেলা বাড়তে লাগল। একটানা চলে বারোটার সময় হিসাব করে দেখলাম মোট চব্বিশ মাইল পথ পেরিয়েছি। এবার সামনে পড়ল একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। বেশ প্রশস্ত নদীটা। দুই তীরে অসংখ্য খাড়া পাথর। মাঝখানেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশাল সব পাথর।

স্রোতের উদ্দামতা দেখে পানিতে নামতে সাহস হলো না আমার। কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না ছোটকাকা। বললেন, 'এইসব পাহাড়ী নদীতে স্রোতের জোর থাকলেও পানির গভীরতা কমই হয়। কাজেই ভয় নেই।' ঘোড়ার পিঠে কষে চাবুক মারলেন তিনি। আইসল্যান্ডের দুর্দমনীয় অশ্বের যে প্রাণের মায়া আছে, এবার তা ভাল করেই জানা গেল। দু'পা এগিয়েই মাথা নিচু করে সে পানি শুঁকতে লাগল। এরপর আর একচুল নড়ানো গেল না। ঘোড়ার এই বেয়াড়ারকম বেয়াদবি সহ্য হলো না ছোটকাকার। একনাগাড়ে চাবুক মারতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু তবু নড়ল না ঘোড়া। এদিক ওদিক মাথা ঝাঁকাতে লাগল শুধু।

ব্যাপার দেখে ছোটকাকা ভীষণ চটে গেলেন। ধমকাতে শুরু করলেন ঘোড়াকে। তখন আইসল্যাণ্ডের বিখ্যাত সেই দুর্দমনীয় অশ্ব নিরুপায় হয়ে পেছনের পা দুটি মুড়ে নিচু হয়ে ছোটকাকার পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ছোটকাকা। হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারলাম না।

হান্স্ তখন বুঝিয়ে বলল, 'এখন জোয়ারের সময়। হাজার চেষ্টা করলেও ও নদী এখন কোনমতেই পেরোনো যাবে না। ভাটার সময় পানি কমলে ভেলায় করে নদী পেরোতে হবে।'

আর কোন উপায় নেই দেখে অপেক্ষা করাই ভাল মনে করলেন ছোটকাকা। হান্স্ গিয়ে পাশের গ্রাম থেকে দু'জন লোক জোগাড় করে প্রচুর কাঠ আর বাঁশ নিয়ে এল। তাই দিয়ে মজবুত করে একটা ভেলা তৈরি করে ফেলল সে।

বিকেল ছ'টায় সেই ভেলায় করে নদী পেরোলাম। বলা বাহুল্য, ঘোড়াগুলোকেও এভাবেই পার করে নেয়া হলো। তারপর আবার শুরু হলো সামনে এগোনো।

রাত তখন আটটা কি সাড়ে আটটা। এই রাত অবশ্য ঘড়ির হিসেবে। আসলে রাতের কোন চিহ্নই নেই, দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। আইসল্যান্ডের মত দেশে জুন-জুলাই মাসে রাত বলতে গেলে হয়ই না। দিনের মতই উজ্জ্বল থাকে মধ্যরাত।

ইতিমধ্যে শীত প্রচণ্ড হতে শুরু করেছে। পেট জ্বলছে খিদেয়। কাছেই একটা গৃহস্থবাড়ি দেখা গেল। খুশিই হয়ে উঠল মনটা। বাড়ির মালিক যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাতটা সেখানে মোটামুটি ভালই কাটল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় গৃহস্থ পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমরা। এখন থেকে পথ আরও খারাপ। দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের অন্তহীন সারি, মেঘের মত দেখাচ্ছে তাদের। পথ একেবারে নির্জন। জন-প্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না পথে। সন্ধ্যার সময় আরেকটা ছোট নদী পেরিয়ে নির্জন প্রান্তরের এক পোড়ো বাড়িতে রাত কাটালাম।

পরদিনও নির্জন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকলাম। পথ ঘাট বলতে কিছু নেই, ব্যাপারটা ভাল লাগল না আমার। রাতের বেলা ক্রেস্লব্ নামে এক গ্রামে পৌঁছুলাম। ছোটকাকা হিসেব করে জানালেন, প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে।

উনিশে জুন তারিখে আমরা কঠিন লাভা বিছানো এবড়ো খেবড়ো পথে। মাঝে মধ্যে দেখি উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্প ধারা। কোথাও নুড়ি পাথরের বোঝাই, কোথাও বা পাঁকে ভরা জলাভূমি, আবার কোনখানে ঝিলের জলে সোনালী রোদ্দুরের ঝিকিমিকি। দূরে স্নেফেলের চূড়াগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক সাদা মেঘের মত।

পর পর ক'দিন একটানা ঘোড়ায় চড়ে চড়ে আমি দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ছোটকাকার উৎসাহের কিছু কমতি তো নেইই বরং বেড়েছে। হান্সের মুখ দেখে তার মনের অবস্থা কিছুই বোঝা গেল না।

বিশে জুন সন্ধ্যায় বুদির নামে এক গ্রামে এসে হাজির হলাম। সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁষে আছে গ্রামটি। এখানেই হান্সের বাড়ি। রাত্তিরে তার বাড়িতেই উঠলাম। ওর বুড়ো বাপ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আজ ওর সাপ্তাহিক মাইনে চুকিয়ে দিলেন ছোটকাকা।

একুশে জুন ভোরে আবার যাত্রা শুরু হলো। স্নেফেল আর বেশি দূরে নয়। প্রায় পৌঁছেই গেছি। এর প্রমাণ: পথ এবার গ্র্যানাইট পাথরে ছাওয়া। কয়েক ঘণ্টা

পরই স্নেফেলের আকাশ ছোঁয়া বিরাট শরীর চোখে পড়ল। পাহাড়ের অধিত্যকা বেয়ে চলা আরম্ভ হলো এবার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলছি—কিন্তু স্নেফেলের ব্যবধান যেন আর কমে না। ছোটকাকা একদৃষ্টে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ডন কুইকজোটের মত মুঠো উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, 'যে করে হোক ওই দানবটাকে আমাদের জয় করতেই হবে।'

পুরো চার ঘণ্টা চলার পর স্নেফেলের পাদদেশের গ্রাম স্ট্যাপিতে গিয়ে পৌঁছলাম। ছোট্ট গ্রাম। মাত্র ত্রিশটি ঘর। ঘরগুলো পাতা দিয়ে তৈরি। পুরো এলাকাটায় হলদে ব্যাসল্ট পাথর স্তূপাকারে ছড়ানো।

স্ট্যাপিতে পৌঁছেই ভয় ভয় করতে লাগল আমার। এবার সত্যিই কি স্নেফেলের মধ্যে দিয়ে নামতে হবে পাতালে? একবার নামলে কোনদিন যে ফিরে আসতে পারব না, সে সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিতই ছিলাম। কাজেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

হান্‌স্‌কে আমাদের আসল উদ্দেশ্য খুলে বললাম। আশ্চর্য! একটু ভয় পেল না সে। তবে কি হান্‌স্‌ও ছোটকাকার মত পাগল হয়ে গেছে? মোটেও অবাক না হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলো সে। বুঝতে পারলাম: আর রেহাই নেই আমার!

হ্যামবুর্গে থাকতেই জোর করে বোঝালে হয়তো ছোটকাকাকে থামানো যেত, কিন্তু এখন এই স্নেফেলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁকে নিরস্ত করা অসম্ভব। পাহাড়ে অনেকেই ওঠে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখও পরীক্ষা করে অনেকে। কিন্তু ওই মুখের মধ্যে দিয়ে পাতালে নেমে যাওয়া? ভাবলেও শিউরে ওঠে শরীর।

বার বার একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে মনে। সাক্‌ন্যুউজমের কথা কি সত্যি? সত্যিই কি স্নেফেলের জ্বালামুখের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে? ধরা গেল যাওয়া যায়। কিন্তু সেই অন্ধকার পাতালের গোলক ধাঁধায় পথ হারানো তো বিচিত্র নয়। অথবা, ভেতরে নেমেছি, এমনি সময় সাতশো বছরের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল আগ্নেয়গিরি, তখন?

তেইশে জুন দু'জন লোক ঠিক করল হান্‌স্‌। লোক দু'জন আমাদের মালপত্র বয়ে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত যাবে। কাঁধে বন্দুক আর পাহাড়ে ওঠার লোহা বাঁধানো লাঠি নিয়ে আমরা তৈরি হলাম। হান্‌স্‌ বুদ্ধি করে এক বোতল পানি নিল সঙ্গে। এই পানিতে আট দিন চলে যাবে আমাদের। সকাল ন'টায় স্ট্যাপির লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্নেফেলে উঠতে শুরু করলাম আমরা।

স্নেফেলের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। বিশাল দুটো চূড়া তার। রিজকিয়াভিক থেকেও এই চূড়া দুটি মেঘের মত দেখা গেছে। কাছ থেকে মনে হলো, বরফ মোড়া ওই চূড়া দুটি যেন আকাশের নীল রঙ গিয়ে ছুঁয়েছে।

নীরবে চলল আরোহণের পালা। পথ এত সরু যে একসাথে একজনের বেশি ওঠা যায় না। হান্‌স্‌ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। পেছনে আমরা। চারপাশে অপূর্ব সব দৃশ্য! একবার দেখলে চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে যায় মানসপটে। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে খনির আকর। জিওলজিস্টদের ধারণা, আইসল্যান্ড আগে ছিল পানির তলায়, ভূমিকম্পের ফলে সাগরের অতল তল থেকে মাথা তুলেছে শূন্যে।

তাই বলে অন্যান্য দেশের মত এখানে পলিমাটির চাদর নেই, ভূত্বক লাভায় ঢাকা। এখনও যে আইসল্যান্ডের মাটির নিচে প্রচণ্ড আগ্নেয় আলোড়ন চলছে, আশপাশে পর্বতের ফাটল দিয়ে উষ্ণ বাষ্প বেরোতে দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সামনের পথটা বড় পাথরে সাজানো। তাকগুলো লাভায় মোড়া, খাড়া পথ ক্রমেই বিপদ সংকুল হয়ে উঠল। খুব সাবধানে লাঠি ঠুকে পা টিপে উঠতে লাগলাম। কষ্ট হচ্ছিল খুব। হান্‌স্‌ কিন্তু দ্রুত পায়ে বেশ সাবলীল গতিতেই চলেছে। আমরা সবাই পিছিয়ে পড়ি বলে একটু গিয়েই ওকে আমাদের জন্যে থামতে হচ্ছিল। তখনও সত্যিকার পাহাড়ে চড়া শুরু হয়নি। শুরু হলো আরও ঘণ্টা তিনেক পর। হান্‌সের কথামত একটু জিরিয়ে নাশতা সেরে না নিলে আর একপাও এগোতে পারতাম না।

খাড়াই বেয়ে যতই উঠতে লাগলাম পথও যেন বেড়েই চলল তত। ফুরাতেই চায় না। মাটির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। শুধু পাথর আর পাথর। পায়ের ধাক্কায় অসংখ্য ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ল নিচে। এক এক জায়গায় পথ এত খাড়া যে হান্‌স্‌ কোনমতে আমাদের টেনে তুলল লাঠির সাহায্যে। ছোটকাকাও আমাকে অনেকবার হাত ধরে টেনে তুললেন।

অনেকক্ষণ ওঠার পর আবার লাভার তৈরি পাথরের সিঁড়ির মত সারি সারি থাক দেখতে পাওয়া গেল। এই লাভার সিঁড়ি না পেলে আমার আর ওঠাই হত না।

সন্ধ্যা সাতটায় হাজার দুই সিঁড়ি ভেঙে একটা প্রশস্ত চত্বরের মত জায়গায় এসে পৌঁছলাম। দূরে—বহু দূরে, চার হাজার ফুট নিচে সমুদ্রের ঘন নীল রঙ দেখা গেল। অল্প একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার আমরা উঠতে লাগলাম।

রাত বারোটায় চূড়ায় পৌঁছলাম আমরা। মধ্যরাতের সূর্যালোকে চারদিক তখন উজ্জ্বল।

ক্ষুধায় ও শীতে কাতর হয়ে গেছি, তবু মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম মধ্যরাতের অপরূপ আলো। চারদিকে বরফের সাদা, মাথার উপর আকাশের নীল, দূরে উজ্জ্বল সোনালী রোদ, দেখতে দেখতে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম।

মনে হলো সারাটা পৃথিবী এখন ঘুমের অথৈ তলে অচেতন হয়ে রয়েছে।

পাঁচ

সমুদ্র থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু স্নেফেলের চূড়ায় বসে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে সেখানেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম পাথরের ওপর। সাথে সাথেই চোখের পাতায় নেমে এল রাজ্যের ঘুম। এমন গাঢ় ঘুম অনেকদিন হয়নি, ঘুম ভাঙল পরদিন দুপুর বেলা।

দিগন্তে অন্য পাহাড়ের চূড়াগুলোকে তখন ছোট ছোট প্রাচীরের মত দেখাচ্ছে। আর নদীগুলোকে দেখাচ্ছে সরু সুতোর মত। দক্ষিণে বরফ-ছাওয়া প্রকৃতির ওপর ঝলমলে রোদ আর পশ্চিমে সাগরের গাঢ় নীল—সবই অপূর্ব দেখতে।

মাল বহনকারী লোক দু'জনকে বিদায় দিয়ে ছোটকাকা আর হান্‌স্ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। পশ্চিম দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ছোটকাকা. 'ওই দ্যাখ্ গ্রীনল্যান্ড!'

অবাক হয়ে গ্রীনল্যাণ্ড নামক বিরাট দ্বীপটার দিকে তাকালাম। বললাম, 'গ্রীনল্যান্ড!'

'অবাক হচ্ছিস কেন? এখান থেকে বেশি দূরে নয় গ্রীনল্যাণ্ড। মাত্র শ'খানেক মাইল হবে।' একটু থেমে বললেন, 'আমরা এখন স্নেফেলের উপর। এর দুটি চূড়ার একটাতে দাঁড়িয়ে আছি এখন আমরা, আরেকটা ওই যে, কোনটার কি নাম জানতে হবে এখন।' হানসের দিকে তাকালেন তিনি, 'তুমি বলতে পারো, আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি এ চূড়াটার নাম কি?'

উত্তর দিল হান্‌স, 'স্কার্টারিস।'

খুশি হয়ে উঠলেন ছোটকাকা, 'তবে আর দেরি কেন? এখুনি নামা যাক।'

হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে উঠল আমার। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। একটু বিচলিত দেখাল না হান্‌স্‌কে। সহজভাবে আমাদের জ্বালামুখের দিকে নিয়ে চলল সে। দুরু দুরু-বুকে চুপচাপ ওদের পিছু নিলাম আমি।

স্নেফেলের প্রধান ক্রেটারের মুখটা মাইলখানেক চওড়া। গভীরতা তার কম করে হলেও দু'হাজার ফুট। পাগল না হলে মানুষ কখনও এমন সাংঘাতিক চিমনির মধ্যে নামার কল্পনা করতে পারে না। মুখের কাছ থেকে একটা রাস্তা অনেকখানি নিচে নেমে গেছে। হান্‌স্‌কে অনুসরণ করে সেই পথ ধরে আমাদের অনুসরণ শুরু হলো। দুপুরে একটা চাতালের মত প্রশস্ত জায়গায় এসে হাজির হলাম। সেখান থেকে দেখলাম আগ্নেয়গিরির তিনটি সর্বনেশে অন্ধকার জ্বালামুখ, এক একটি মুখের পরিধি প্রায় একশো ফুটের মত। এত ভয় পেয়ে গেলাম যে গহ্বরগুলোর কাছে গিয়ে নিচে তাকানোর সাহস পর্যন্ত হলো না আমার।

ছোটকাকা পাগলের মত ছুটাছুটি করে মুখগুলো দেখছেন আর বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন। ব্যাপার দেখে এই প্রথমবার একটু অবাক হলো হান্‌স্।

হঠাৎ ছোটকাকা তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই তীব্র গমগমে কণ্ঠস্বর শুনে আমি মনে করলাম তিনি সেই অতল গহ্বরের মধ্যেই পড়ে গেছেন। কিন্তু না, তাকিয়ে দেখি বিরাট একটা পাথরের সামনে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

ছোটকাকার চোখে এমন বিস্ময়! তাড়াতাড়ি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই আঙুল তুলে দেখালেন। দেখলাম পাথরটার গায়ে কতকগুলো রুনিক হরফ খোদাই করা। কোন কোন জায়গা ক্ষয়ে গেলেও পড়া যায়। পাথরটার গায়ে লেখা, 'আর্‌ন্ সাক্‌ন্যুউজম।'

ছয়

আর্‌ন্ সাক্‌ন্যুউজম! পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম অভিভূত বিস্ময়ে।

ছোটকাকার সিদ্ধান্তকে আর অহেতুক বলে উড়িয়ে দেয়া চলবে না। দুঃসাহসী আর্‌ন্ সাক্‌ন্যুউজম--আইসল্যান্ডের সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক— এখানকারই কোন গহ্বর দিয়ে পাতালে নেমেছিলেন, এ লেখা তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

হেসে বললেন ছোটকাকা, 'কি, আরও প্রমাণ চাই?'

এমন অকাট্য প্রমাণের পর আর কোন কথা চলে না। অসহায় ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাঁঝ হয়ে এল। গহ্বরের পাশে, এই চত্বরেই রাত কাটাতে হবে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। পা দুটো টন টন করছে ব্যথায়। এতটা পথ নামা কিছু আর চাট্টিখানি কথা নয়।

হান্‌স্ একটু সমতল জায়গা খুঁজে নিয়ে বিছানা পাতার জোগাড় করল। জায়গাটা কঠিন লাভার-প্রলেপে মোড়া। তার উপর চাদর পেতে আমি আর হান্‌স্ শুয়ে পড়লাম। ছোটকাকা আলো জ্বেলে চারদিকটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। হান্‌সের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নাক ডাকাতে শুরু করেছে সে। শরীরে এত ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না আমার। কেবলই দুর্ভাবনায় ভরে উঠছে মন।

আলো নিয়ে ছোটকাকা ইতিমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হলো, অন্ধকারে চারপাশে অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন সব উঠে এসেছে পাতালের অন্ধকার গহ্বর বেয়ে।

ভয় পেতে পেতেই একসময় দু চোখ জুড়িয়ে এল ঘুমে। সকাল বেলা ঘুম ভাঙলে দেখলাম ছোটকাকা হাঁড়ির মত মুখ করে বসে আছেন। প্রথমে তাঁর রাগের কারণ না বুঝলেও পরে বুঝলাম।

আকাশ মেঘলা বলেই ছোটকাকার এই অসহায় রাগ। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কার্টারিসের ছায়া যে জ্বালামুখের উপর পড়বে সে পথ দিয়েই নামতে হবে পাতালে। আকাশ মেঘলা থাকায় স্কার্টারিসের কোন ছায়াই পড়ল না। এই জুলাই মাসের গোড়ায় সূর্যের সাক্ষাৎ না পেলে একটি বছরের জন্যে যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে।

রাগের চোটে সূর্যকে বার বার ধমকালেন ছোটকাকা, অভিশাপ দিলেন। কিন্তু কান দিল না সূর্য। সারা দিনে একটি বারের জন্যেও দেখা মিলল না তার, আমার জন্যে অবশ্য সুবিধা হলো এতে। একটানা পরিশ্রমের পর আয়েশ করে শুয়ে শুয়ে ছুটিটা উপভোগ করলাম।

পর পর তিনদিন আকাশ মেঘলা হয়ে থাকল, ছোটকাকার রাগও ক্রমে বেড়ে চলল। চৌঠা জুলাই কানের কাছে ছোটকাকার চেঁচামেচি শুনে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। চোখ মেলতেই দেখি সোনালী রোদে ঝলমল করছে চারদিক। আস্তে আস্তে দুপুর হলো। রোদের রঙও উজ্জ্বল হতে লাগল ক্রমে। তারপর, সত্যিই স্কার্টারিসের

ছায়া ক্রমশ সরে এসে পড়ল একটি জ্বালামুখের উপর।

খুশির ঠেলায় ছোটকাকা এই বুড়ো বয়সেই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলেন। একটু পরই অবশ্য নাচ থামিয়ে আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন। পৃথিবীর অন্দরে রওনা হতে হবে এবার।

প্রস্তুত হয়েই ছিল যেন হান্স্, উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সে। বলল, 'চলুন।'

ঘড়িতে দেখলাম বেলা একটা। পাথরের খাঁজ বেয়ে পাতালে নামা শুরু হলো আমাদের।

সাত

পাথরের খাঁজ কাটা সিঁড়ি বেয়ে পাতালের দিকে নামতে লাগলাম আমরা। জ্বালামুখের পরিধি ক্রমশ বেড়ে গিয়ে শ'তিনেক ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো গহবরের পাঁচিল সোজা নিচে নেমে গেছে। পাঁচিলের গায়ে মাঝে মাঝে খাঁজের মত পাথর বেরিয়ে আছে। সিঁড়ির কাজ হয়ে গেল তাতে। উপরে কোথাও একটা দড়ি বাঁধা গেলে সহজেই সেই দড়ি বেয়ে নিচে নামা যায়। কিন্তু তার জন্যে অনেক অনেক লম্বা দড়ির দরকার। ছোটকাকাকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'তার জন্যে ভাবনা নেই।'

হান্সের মালপত্রের বস্তা থেকে চারশো ফুট লম্বা একটা দড়ি বের করে নিলেন তিনি। দড়ির ঠিক মাঝখানটা পাঁচিলের গায়ের একটা বেরিয়ে থাকা পাথরে দু-তিন পাক জড়িয়ে দিলেন। বুঝলাম, দু'হাতে দড়ির দুই দিক ধরে পাথরের খাঁজ বেয়ে নামতে হবে। দু'শো ফুট নেমে একপ্রান্ত ধরে টানলেই উপর থেকে খুলে আসবে দড়ি। এই পদ্ধতিতে একটা দড়িকেই কাজে লাগিয়ে সহজেই আরও নিচে নামা যাবে।

'এতেই চলবে কি বলিস?' বললেন ছোটকাকা, 'কিন্তু সমস্যা হলো, মালপত্রগুলোর কি করি? যতটুকু সম্ভব সাথে করে নিতে হবে, বিশেষ করে যেগুলো একটুতেই ভেঙে যেতে পারে। হান্স্, তুমি নাও কয়েকটা যন্ত্রপাতি আর খাবার। অ্যাকজেল, কিছু খাবার আর গুলি বারুদ তোর কাছে থাক। বাকি যন্ত্রপাতি আর খাবারটুকু আমি নিচ্ছি।'

বললাম, 'তা না হয় নেয়া গেল, কিন্তু বিছানাপত্র, কাপড় চোপড় আর অন্য সব জিনিসের কি হবে?'

নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন ছোটকাকা, 'সে তোর ভাবতে হবে না। ওগুলো আপনিই আমাদের সাথে যাবে।'

বাকি জিনিসগুলো একসাথে খুব ভাল রকম বেঁধে গহবরের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। শোঁ করে নেমে গেল বাণ্ডিলটা। যতক্ষণ দেখা গেল, সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন ছোটকাকা। তারপর বললেন, 'চল, এবার নামা যাক।'

দ্বিরুক্তি না করে পাতালে নেমে চললাম। সবচে আগে হান্স্, তারপর

ছোটকাকা আর সবার শেষে আমি। আলগা পাথরগুলো পায়ের আঘাতে ঝুর ঝুর করে নিচে পড়তে লাগল।

আধ ঘণ্টা নামার পর দড়ির একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু প্রশস্ত চত্বরের মত দেখা গেল। সেখানেই থামলাম আমরা। টান মেরে উপর থেকে দড়িটা খুলে নিলেন ছোটকাকা। আবার দড়ি বাঁধা হলো আগের পদ্ধতিতে। আবার নিচে নেমে চললাম।

নিজেকে সামলাতেই তখন ব্যস্ত। শিলাস্তরের বিন্যাসের দিকে নজর দেয়ার মত অবসর ছিল না। এই অবস্থায় চার দিকে শিলাস্তরের লক্ষণ খেয়াল করতে করতে নামবে এমন পাগল ভূতত্ত্ববিদ আছে কিনা সন্দেহ হলো আমার। কিন্তু আমার সন্দেহের নিরসন করে দিয়ে ছোটকাকা কাজটা করতে করতেই নামতে থাকলেন। রকম দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একসময় ছোটকাকা বললেন, 'হুঁ, যা ভেবেছি, তাই। শিলাস্তরের বিন্যাস দেখেই বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব একটা উত্তাপ নেই। আমরা যে শিলাস্তরের ভেতর দিয়ে চলছি এটাই হলো পাথরের আদিম অবস্থা। ধাতব পদার্থের গায়ে ভেজা বাতাস লেগে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিল, এখনও তার চিহ্ন আছে পাথরের গায়ে। ভাল করে খেয়াল করলেই পরিষ্কার দেখবি সব, অ্যাকজেল।'

কোন কথা বললাম না। দড়ি ধরে কোনমতে টাল সামলে নামতে লাগলাম শুধু। গহ্বর ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। আলগা পাথরের টুকরোগুলো আরও জোরে নিচে পড়তে লাগল। গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল তাদের নিচে পড়ার শব্দ।

প্রায় দু'হাজার আটশো ফুট নামার পর ছোটকাকা জানালেন আমাদের পথ আপাতত এখানেই শেষ। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে তখন। নিচে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করা এই রাত্তিরে সহজ হবে না। এখানেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হলো তাই। খুঁজে পেতে একটুকরো সমতল জায়গা পাওয়া গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু মুখে দিয়েই শুয়ে পড়লাম।

কবরের নীরবতা এখন চারপাশে। ঘনঘোর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল আটটায়। সূর্য রশ্মির সরু একটা রেখা এসে পড়েছে আমাদের পাশে।

আমার ঘুম ভাঙতেই হেসে বললেন ছোটকাকা, 'কি, কেমন লাগছে তোর? কাল রাতের মত শান্তিতে ঘুমিয়েছিস আর কখনও? গাড়ি ঘোড়ার গোলমাল নেই, লোকজনের শোরগোল নেই—কী নিস্তব্ধ চারদিক! অপূর্ব, তাই না?'

'এত নিস্তব্ধ বলেই তো ভয় করছে বেশি।' বললাম আমি।

হেসে উঠলেন ছোটকাকা, 'ভয় করছে তোর? এখনও তো অনেক পথ বাকি। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা এখন সমুদ্র সমতলে আছি মাত্র।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তা কি করে হয়?'

আবার হাসলেন তিনি, 'ব্যারোমিটার দ্যাখ না—ভূপৃষ্ঠের মত এখানেও বাতাসের চাপ সমান। যখন ব্যারোমিটার ছেড়ে বাতাসের চাপ মাপতে ম্যানোমিটার লাগবে, তখনই বুঝতে হবে সত্যি আমরা পাতালে প্রবেশ করছি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই চমকে উঠলাম, 'ছোটকাকা, পৃথিবীতে যে পরিমাণ বাতাসের চাপ সহ্য করা আমাদের অভ্যাস, এখানে তারচে বেশি হলে সহ্য করা যাবে কি?'

এত সাংঘাতিক কথাটা মনে পড়িয়ে দিলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হলো না ছোটকাকাকে. 'খুব আস্তে আস্তে নামছি আমরা। ঘন হাওয়ায় শ্বাস নিতে নিতে ক্রমশ অভ্যাস হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে উপরের দিকে বাতাসের চাপ ক্রমশ কমে যায়। বাতাসের চাপের তারতম্য সহ্য করতে না পারলে বেলুনে করে মানুষ কখনও আকাশে উড়তে পারত না।'

'মানে, তুমি বলতে চাইছ নিচের ভারী বাতাসেও আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'আর অভ্যাস হলেই সহ্য হয়ে যাবে। এখন আয় তো, কাল যে বাণ্ডিলটা ফেলেছিলাম সেটার খোঁজ করি।'

হান্‌সৃই বাণ্ডিলটা খুঁজে বের করল কিছুক্ষণ পরে। খাওয়া সেরে হান্‌স্ আর ছোটকাকা নিজেদের টর্চ জ্বালিয়ে নিলেন। সেই আলোয় পথ দেখে দেখে পাতালের অন্ধকারে নেমে চললাম আবার।

বারোশো ঊনত্রিশ সালে শেষবারের মত অগ্ন্যুদগার করেছিল স্নেফেল। এখনও তার চিহ্ন দেখা গেল। সেই আগ্নেয় উদগার জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গেছে। টর্চের আলোয় তা জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। মাথার উপরে আলগা হয়ে ঝুলে থাকা, স্বচ্ছ কাঁচের মত স্ফটিকমণি ফানুস ঝাড়ের মত ঝুলছে। লাল, নীল, সবুজ নানা রঙের সব ফানুস। তাদের উপর আলো পড়ে তৈরি হয়েছে পাতালের রঙধনু। এই অপরূপ সুন্দরের দিকে চেয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম।

অনেক পথ পেরোলাম সেদিন। তাপমাত্রা সে অনুপাতে খুব একটা বেড়েছে বলে মনে হলো না।

রাতে খেতে বসে খেয়াল করলাম পানি কমে এসেছে। আগেও পানির কথা ছোটকাকাকে অনেকবার জানিয়েছি। কিন্তু ওঁর সেই এক কথা, 'ঝরনা পাওয়া যাবে পথে। কাজেই ভয় কি?' কিন্তু এখন যখন দেখলাম অর্ধেকেরও বেশি পানি ফুরিয়ে গেছে, কথাটা আবার জানালাম ওঁকে। শুনে ছোটকাকা বললেন, 'এতে ভাবনার কি আছে? ঝরনার পানি পাওয়া যাবে পথে। এই লাভার দেয়াল ভেদ করলেই পানির দেখা মিলবে।'

'কদ্দূর গেছে এ দেয়াল কি করে বুঝবে? নিচের দিকে খুব একটা নেমেছি মনে হয় না আমার। সমতল জায়গাতেই বোধ হয় চলছি আমরা। কারণ নিচে নামলেই তো উত্তাপ বাড়ার কথা। কিন্তু তাপ একটুও বাড়েনি। বড় জোর আমরা এগারো কি বারোশো ফুট নেমেছি।'

হো হো করে হেসে উঠলেন ছোটকাকা, 'বুদ্ধু নাকি তুই! আমরা এখন সমুদ্রতলের চেয়েও দশ হাজার ফুট নিচে।'

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল আমার, 'অ্যাঁ? বলো কি তুমি?'

পরদিন ভোরে আবার চলা শুরু হলো আমাদের। দুপুরে দুটো সুড়ঙ্গ পথের মোহনার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দুটো পথই চাপা। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের

সামনে দাঁড়িয়ে আমি যদি অনন্তকাল ভাবতাম—কোন্ পথ দিয়ে যাব, তাহলেও পথের সন্ধান মিলত না। ছোটকাকা কিন্তু চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, 'পুবদিকের পথটা দিয়েই যাওয়া যাক, কি বলিস?'

এগোতে এগোতে দেখলাম সুড়ঙ্গের পরিধি অত্যন্ত কম। তোরণের পর তোরণ যেন আমাদের জন্যেই উন্মুক্ত হয়ে আছে। মাইল খানেক যেতেই তোরণগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। কোথাও আমাদের মাথা নুইয়ে চলতে হলো, কোথাও বা এগোতে হলো বুকে হেঁটে, অতি সন্তর্পণে।

তাপমাত্রা এখনও সহনীয়। এ পথেই একদিন প্রচণ্ড বেগে তরল আগুনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। কথাটা মনে পড়তেই শিউরে উঠলাম। এখনও কি এই আগ্নেয়গিরির কোথাও চলছে দ্রবীভূত সেই আগুনের প্রচণ্ড তাণ্ডব? না, সে-দৃশ্য আর কল্পনা করতে পারি না।

এত কষ্টের পরও নির্বিকারভাবে দিব্যি এগিয়ে চললেন ছোটকাকা। হান্‌সেরও ঠিক তেমনি বিরামহীন গতি। কিন্তু আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল এগোতে।

সন্ধ্যার একটু পরে বিশ্রামের জন্যে থামলাম। হিসাব করে দেখা গেল মোটে দু'মাইল পথ অতিক্রম করেছি সারাদিনে। নিচের দিকে নেমেছি মাত্র আধ মাইল।

পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু হলো। কিছুটা যাবার পরই দেখা গেল সুড়ঙ্গ পথ নিচের দিকে না নেমে সমতল ভাবেই চলেছে। আমার মনে হলো ক্রমশ উপরের দিকে উঠছি। অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। আস্তে হাঁটছি দেখে ছোটকাকা অধৈর্য গলায় তাড়াতাড়ি চলতে বললেন।

অবসন্ন গলায় বললাম, 'আর পারছি না আমি।'

'পারছিস না!' অবাক হলেন যেন ছোটকাকা, 'এত সুন্দর রাস্তায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোর? মোটে তো তিন ঘণ্টা হলো রওনা দিয়েছি।'

'আমার পা ভেঙে আসছে, ছোটকাকা! উপরে ওঠা কিছু আর সহজ ব্যাপার নয়!'

'সর্বনাশ! পাগল হয়ে গেলি নাকি? কোন্‌টা উঁচু, কোন্‌টা নিচু—তাও জানিস না? চল্, চল!' তর্জনী সঙ্কেতে তিনি সামনের পথ দেখিয়ে দিলেন। দ্বিরুক্তি না করে মরিয়া হয়ে এগোতে লাগলাম।

দুপুর বেলা দেয়ালের রূপ বদলে গেল। টর্চের আলোয় আর তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। পাথরের দেয়ালের গা থেকে বিদায় নিয়েছে লাভা। একটু পরই পাথরও পেছনে পড়ল, তার স্থান দখল করল স্লেট আর চুন।

বিস্ময়ে অর্ধস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম। ছোটকাকা ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। বললাম, 'দ্যাখো, ছোটকাকা, কোথায় এসে হাজির হয়েছি। পৃথিবীতে যখন প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রথম উদ্ভিদ দেখা দিয়েছিল সেই পরিবেশ এখন আমাদের চারপাশে।' দেয়ালের গায়ে আলো ফেলে দেখালাম ওঁকে। একটুও অবাক হলেন না তিনি। নীরবে এগিয়ে চললেন।

তবে কি আমারই ভুল? হয়তো। কিন্তু আমার ধারণা ঠিক হলে আদিম পৃথিবীর উদ্ভিদ চিহ্ন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তারই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরই টের পেলাম পানির উপর দিয়ে চলছি। এখানে নদী নেই, সাগর

নেই—তাহলে পানি এল কোত্থেকে? উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এ আর কিছু না। আরও পরে দেয়ালের গায়েও উদ্ভিদ জগতের অভ্রান্ত চিহ্ন দেখা গেল।

ছোটকাকা তবু এগোতে থাকলেন। আর সহ্য হলো না। একটা ঝিনুক কুড়িয়ে ওঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'এই দ্যাখ, ট্রাইলোবাইট জাতের ঝিনুক। এ দেখেও কি মনে হয় না—।'

'যে আমরা পথ হারিয়েছি?' অকম্পিত স্বরে আমার কথাটা শেষ করলেন ছোটকাকা। তারপর বললেন, 'পথ তো অনেকক্ষণ হলো হারিয়েছি। লাভার দেয়াল শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বুঝেছি, ঠিক পথে আসছি না। কিন্তু এ পথটাও যে পাতালে যায়নি তার ঠিক কি? এর শেষ না দেখে ফিরে যাব কেন?'

অবাক গলায় জানতে চাইলাম, 'পথের শেষ না দেখে ফিরবে না? ওদিকে যে পানি ফুরিয়ে এল!'

'তাতে কি!' নির্বিকার সুরে ছোটকাকা বললেন, 'এখন থেকে অল্প অল্প করে খেতে হবে।'

আট

ছোটকাকার কথার প্রতিবাদ করার মত অবস্থা আমার নেই। শুধু কতটুকু পানি অবশিষ্ট আছে দেখে নিলাম। যা আছে বড়জোর তিনদিন চলবে আর। কিন্তু ক'দিন লাগবে এ পথের শেষ দেখতে, কে জানে? ভেবে লাভ নেই। ছোটকাকাকে বাধা দিয়েও কাজ হবে না।

চলতে চলতে মার্বেলের রাজ্যে এসে পৌঁছুলাম। সাদা, লাল, নীল, হলুদ বিচিত্র রঙের সব পাথর। নানা জাতের মাছ আর সরীসৃপের কঙ্কাল ইতস্তত ছড়ানো। তার মানে, ক্রমশ সৃষ্টির আদি যুগের দিকে চলেছি। তবে কি সত্যিই পৃথিবীর অন্দর মহলে এসে গেছি?

একসময় সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গে নামল আর একটা রাত। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় কোনমতে খাওয়াটা সেরে নিলাম। ফুরিয়ে যাবার ভয়ে পানি বেশি খাওয়ার সাহস হলো না। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে শুয়ে পড়লাম পাথরের উপর।

পরদিন একটানা দশ ঘণ্টা চলার পর দেখলাম, দেয়ালের গায়ে টর্চের আলো আর আগের মত প্রতিফলিত হচ্ছে না। পরীক্ষা করে দেখা গেল মার্বেল, চুন, শ্বেত পাথর এমন কি স্লেট পাথরও দেয়ালের গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে শুধু ঘন কালো আস্তরণে ঢাকা সুড়ঙ্গ প্রাচীর। দেয়ালের গা থেকে হাত সরাতেই দেখলাম, কালো হয়ে গেছে হাত।

বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কয়লা—কয়লার খনি?'

হেসে বললেন ছোটকাকা, 'এই খনিতে এর আগে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। আমরাই এ দেশের প্রথম আগন্তুক।' হান্‌সের দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'আজ এখানেই থামব, হান্‌স্। অনেক এগোনো গেছে। এক দিনের পক্ষে এই যথেষ্ট।'

রাতের খাওয়া সেরে নিতে বসলাম। খেতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ভাগে যে পানিটুকু পড়ল তাই পান করে শুয়ে পড়লাম।

ছোটকাকা আর হান্‌স্ সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু পানির চিন্তায় আমার চোখে ঘুম এল না। অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা আর টেরই পেলাম না।

পরদিন যথারীতি যাত্রা শুরু হলো। কিছুদূর যেতেই দেখলাম বিশাল গহ্বরের মুখ সর্বনাশের ইঙ্গিত নিয়ে অন্ধকারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। সাবধানে গহ্বরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম।

সেদিনও সারাদিন হেঁটে পথের শেষ পাওয়া গেল না। সুড়ঙ্গটা কোনদিন শেষ হবে বলে মনে হলো না আমার। তবু এগিয়েই চললাম। বুঝতে পারলাম ছোটকাকাও ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠছেন।

রাত দিন বোঝার উপায় নেই কিছু। চারপাশে ঘন অন্ধকার। টর্চের আলো যেন সেই অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ঘড়ি দেখে নিয়মিত সময়ে আমরা বিশ্রাম নিই, খাই, ঘুমাই, তারপর আবার চলতে থাকি।

ঘড়িতে সন্ধ্যা ছ'টা বাজল। সে সময় দেখলাম ওটা। ঠিক আমাদের সামনেই একটা নিরেট দেয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এ পথের তাহলে এখানেই শেষ।

ছোটকাকা নির্বিকার। শুধু বললেন, 'গুড। পথের শেষ তাহলে পাওয়া গেল। চল, ফিরি। আফসোস করে লাভ নেই। পথ ভুল করেছিলাম—এবার ফিরে গিয়ে আসল পথে এগোব।'

এত হতাশার মাঝেও হাসি পেল আমার। মৃদু স্বরে বললাম, 'ফিরব তো বটেই, কিন্তু শক্তি কই?'

'নেই মানে? এতটা পথ আসতে পারলাম, আর ফিরতে পারব না?'

আশঙ্কাটা প্রকাশই করে ফেললাম, 'ছোটকাকা, কালই সব পানি ফুরিয়ে যাবে।'

'নিকুচি করেছে তোর পানির।' অধৈর্য হয়ে উঠলেন তিনি, 'পানি ফুরিয়ে যাবে বলে কি আমাদের ধৈর্য, সাহস, সংকল্প সবই ফুরিয়ে যাবে?'

এ কথার জবাব দেব সে সাধ্য আমার ছিল না। ভাবতে লাগলাম, এতটা পথ আসতে লেগেছে পাঁচ দিন, ফিরে যেতেও তো পাঁচ দিনের ধাক্কা। ততদিন পানি ছাড়া বাঁচব?

কিন্তু এখানে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও তো বাঁচার আশা নেই। গেলেও মরতে হবে, থাকলেও তাই। সুতরাং, অযথা দেরি না করে ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম আমরা।

নয়

সীমাহীন কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করে এগোতে লাগলাম আমরা। কষ্ট সহ্য করার

অসাধারণ ক্ষমতা ছোটকাকার। দাঁতে দাঁত চেপে এগোতে থাকলেন তিনি। হান্সের কষ্ট হচ্ছে এমন কোন লক্ষণই চোখে পড়ল না। নীরবে চলছে সে।

প্রথম দিনই ফুরিয়ে গেল পানি। পানির বদলে জিন পান করার চেষ্টা করলাম। তরল আগুনে পুড়ে গেল জিভ, গলা। বুক জুড়ে দারুণ পিপাসা, তবু আর জিনের বোতলের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হলো না আমার, মনে হতে থাকল চারদিকে চুল্লির অসহ্য উত্তাপ, মরুভূমিও বোধ হয় এরচে ভীষণ নয়।

শেষটায় আর পারলাম না। একপা চলার ক্ষমতাও নেই আমার। বার কয়েক চেতনা হারালাম। ছোটকাকা আর হান্স্ আমাকে খাড়া রাখার চেষ্টা করল। অসহ্য পিপাসা আর প্রচণ্ড পরিশ্রমে ওঁরাও ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ছেন।

বহু কষ্টে পাঁচটা দিন কাটল শেষ পর্যন্ত। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত দেহটা টেনে টেনে, কখনও পায়ে, কখনও বুকে হেঁটে—সেই সুড়ঙ্গের মোহনার কাছে এসে পৌছুলাম। বেলা তখন দশটা। পৌছেই জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম ছোটকাকা আমার মাথা কোলে নিয়ে অপরাধীর মত মুখ করে বসে আছেন। বলছেন, 'তোকে সঙ্গে আনাটাই ভুল হয়েছে। ছিঃ ছিঃ যদি একটা কিছু ঘটে যায়! হায়রে, ছেলেটাকে কেন নিয়ে এলাম—'

ছোটকাকার এই করুণ আক্ষেপ শুনে বুকের কাছটায় একটু ব্যথা অনুভব করলাম। আমার দু'হাতে তুলে নিলাম ওঁর হাত দুটো। কেঁদে ফেললেন ছোটকাকা। নিজের পানির বোতলটা আমার মুখের কাছে ধরে বললেন, 'অল্প একটু পানি আছে—।'

চমকে উঠলাম। স্বপ্ন দেখছি না তো? পাগল হয়ে গেলেন নাকি ছোটকাকা? এক ফোঁটা পানিও তো ছিল না বোতলে!

বোতলটা আমার মুখে উপুড় করে ধরলেন ছোটকাকা। সত্যিই পানি আছে বোতলে। শুকনো জিহ্বায় যেন অমৃত ঝরে পড়ল। তৃপ্তিতে চোখ দুটো আধ বোজা হয়ে এল।

ছোটকাকা বললেন, 'অ্যাকজেল, এটুকুই আমার শেষ সম্বল, শেষ মুহূর্তের জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। আর এক বিন্দুও নেই। আগেই বুঝেছিলাম, এ পর্যন্ত আসতেই কাহিল হয়ে পড়বি। তাই পানিটুকু তোর জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। কতবার তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ওই বোতলের দিকে তাকিয়েছি, হাতও বাড়িয়েছি, মনে করেছি শুধু একটি ফোঁটা খাই। কিন্তু খাইনি—তোর জন্যেই রেখে দিয়েছি।'

খালি বোতলটা উপুড় করে ধরলেন তিনি। এবার কেঁদে ফেললাম। ছোটকাকা মানুষ, না মহামানব?

ওই এক ফোঁটা পানিতে তৃষ্ণার জ্বালা সামান্যই কমল, কিন্তু শরীরে একটু জোর পেলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এখন খানিকটা ভেজার পর কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলাম। কাতর ভাবে বললাম, 'আর না, ছোটকাকা। পানি যখন ফুরিয়ে গেছে, পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চলো, এখুনি রওনা দিই।'

চুপ করে আমার কথা শুনলেন ছোটকাকা। জবাব দিলেন না।

আমি আবার বললাম, 'ফিরতে আমাদের হবেই, ছোটকাকা। তবে শেষ পর্যন্ত

স্নেফেলের চূড়ায় ওঠার শক্তি থাকবে কিনা সন্দেহ।'

অস্ফুটে বললেন ছোটকাকা, 'এতটা এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব!'

'ফিরতে আমাদের হবেই।' আরও জোর দিয়ে বললাম, 'কাজেই আর একমুহূর্ত দেরি করা উচিত না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন ছোটকাকা। বিবর্ণ মুখে তাঁর হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। মুখ দেখে বোঝা গেল, কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। অবশেষে প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওঁর চোখ মুখ। বললেন, 'বুঝেছি, তুই হতাশ হয়ে পড়েছিস, অ্যাকজেল। কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে গলা ভিজিয়েও তোর হারানো সাহস ফিরিয়ে আনতে পারলি না। এখনও হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বলছিস? কখনও কি তোর মনে আশার আলো জ্বলবে না, অ্যাকজেল?'

থতমত খেয়ে গেলাম। এমন কথা আশা করিনি। সংকটময় মুহূর্তে কোন মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। অস্ফুটে বললাম, 'তবে কি ফিরতে চাও না তুমি, ছোটকাকা?'

ছোটকাকা বললেন, 'যখন পরিবেশ আমার অনুকূলে তখন ফিরে যাব কেন? নাকি তা কখনও যাওয়া যায়?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম, 'পরিবেশ তোমার অনুকূলে! কি বলছ তুমি, ছোটকাকা?'

'ঠিকই বলছি। পানির অভাবই তো এখন আমাদের সবচে বড় বাধা? সে কারণেই তো ফিরে যেতে চাস? কিন্তু ভেবে দ্যাখ, এবার ঠিক পথেই এগোব। আর্ন সাকন্যুউজমও এ পথেই গিয়েছেন। পানি না থাকলে এ পথে যেতে পারতেন না তিনি। আমি বলছি এ পথে পানি পাবই আমরা।'

'যদি না পাওয়া যায়?'

বাধা দিয়ে বললেন ছোটকাকা, 'কলম্বাসের কাহিনী জানিস না? যখন ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায় আর একটার পর একটা বিপদের আঘাতে ভেঙে পড়েছিলেন কলম্বাস, তাঁর নাবিকেরা ঠিক করেছিল আর সামনে এগোবে না, তিনি তখন তাদের কাছে মাত্র তিন দিন সময় চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—তিন দিনের মধ্যে যদি নতুন কোন দেশের মাটি চোখে পড়ে, ভাল—নইলে দেশে ফিরে যাবেন। নাবিকেরা সে সময়টুকু তাঁকে দিয়েছিল, যে জন্যে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আমেরিকা। আমি তোর কাছে তিনদিন সময়ও চাই না, অ্যাকজেল, শুধু আজকের দিনটা অপেক্ষা কর। যদি এর ভেতর পানি না পাওয়া যায়, তবে কথা দিচ্ছি, কালই তোর সাথে ফিরে যাব।'

এ কথায় রাজি না হয়ে পারা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। ছোটকাকা বললেন, 'বেশ। আর এক সেকেন্ডও দেরি না। পশ্চিম সুড়ঙ্গে এখনই ঢোকা যাক।'

আবার যাত্রা শুরু হলো। পা বাড়ানোর সাথে সাথেই মনে হলো এ গহ্বর থেকে বেরিয়ে জীবনে আর ফিরে যেতে পারব না বাইরের পৃথিবীতে। কে জানে, এ সুড়ঙ্গ বাঁক নিয়ে নিয়ে কোথায় কোন অন্ধকারে গিয়ে শেষ হয়েছে! তবু এগিয়ে চললাম। কখনও গাঢ়, কখনও ফিকে নীল স্লেট পাথরের দেয়াল। দেয়ালের গায়ে কোথাও খালি সোনা, কোথাও প্ল্যাটিনাম আর সোনার সুতো বিনুনির মত জড়িয়ে

আছে।

স্লেট পাথরের পর শুরু হলো স্বচ্ছ ফটিকের মত ধাতব পদার্থ। রাশি রাশি অভ্র টর্চের আলোয় হীরার মত জ্বলছে। সাঁঝের একটু আগে এই হীরার ঝিলিক অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দ্যুতিহীন সাধারণ পাথরের দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম।

আরও দু'ঘণ্টা কাটল। পানির কোন চিহ্নই নেই কোথাও। যন্ত্রণাটা বেড়ে চলল আমার। বুঝতে পারছি আমার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছে ছোটকাকা ও হান্‌সের। কিন্তু থামলেন না ছোটকাকা। সামনে এগিয়ে চললেন।

হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। পা দুটো কথা শুনছে না। তবুও কোনমতে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চললাম। একসময় অস্ফুট আর্তচিৎকার করে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম ছোটকাকা আর হান্‌স্ আমার পাশে পাথরের উপর শুয়ে ঘুমাচ্ছে। মরিনি, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর তখন আমার অবস্থা। নিঃসীম অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেললাম। হঠাৎ দেখলাম, হান্‌স্ ঘুম থেকে উঠে একটা টর্চ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় যেন চলেছে। আমাদের মৃত ভেবে কি চলে যাচ্ছে ও? প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। শুকনো গলা থেকে শব্দ বেরোল না। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ধরে ফেলি ওকে। কিন্তু দেহটাকে টেনে তুলতে পারলাম না। ধীরে ধীরে হান্‌সের টর্চের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, পায়ের শব্দ ঢাকা পড়ল নিঃসীম নীরবতায়। যন্ত্রণায়, দুর্ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে পড়ল হান্‌স্ উপরে না উঠে নিচে নেমে গেছে। নিচে তো পাতালের অন্ধকার! তাহলে, সে গেল কোথায়? পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে উপরে উঠত, নিচে নামত না।

কিছু বোঝার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। সেই অন্ধকারে চোখ মেলে পড়ে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে হান্‌সের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

হান্‌স্ ফিরে এসে ধাক্কা মেরে ছোটকাকার ঘুম ভাঙাল। বিড় বিড় করে কি যেন বলল ওঁকে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন ছোটকাকা, 'পানি! কোথায় পানি? কোথায়?'

চমকে উঠলাম। কোনমতে টানা হেঁচড়া করে খাড়া করলাম শরীরটাকে। হান্‌সের কথা শুনলাম, 'ওই যে নিচে। ওখানেই পানি আছে।' আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওর হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম। কিন্তু হান্‌সের মুখ চীনাদের মতই নির্বিকার।

পানির আশা শরীরে নতুন শক্তি আনল। তখুনি রওনা দিলাম আমরা। অনেক কষ্টে হাজার দুই ফুট নিচে নামলাম। হঠাৎ ছোটকাকা আবার বললেন, 'ভাল করে কান পেতে শোন। শুনতে পাচ্ছিস কিছু?'

গভীর আগ্রহে কান পেতে শুনলাম, পাথরের কঠিন দেয়াল ভেদ করে দূরাগত বজ্রধ্বনির মত উদ্দাম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওই শব্দ নিঃসন্দেহে কল্লোলিত ঝরনার।

যত নিচে নামতে থাকলাম ততই স্পষ্ট হতে লাগল আওয়াজটা। দেয়ালের ওপাশে হয়তো ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই—পানি তো চোখে পড়ছে না। হয়তো

এরই নাম মৃগতৃষ্ণা।

আরও আধ ঘণ্টা কাটল। আরও মাইলখানেক নামলাম। ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকল শব্দটা। ফিরে দাঁড়ালাম। দেয়ালের যেখানটায় শব্দ সবচেয়ে স্পষ্ট সেখানে দাঁড়াল হান্স্। বিন্দুমাত্র দাঁড়াবার শক্তি নেই তখন আমার। পাথরের উপর বসে পড়লাম ধপ করে।

এ দেয়াল ভাঙলে পানি পাওয়া যাবে। সে তো অসম্ভব! এ দেয়াল ভাঙার ক্ষমতা এখন কারও নেই। তাহলে মৃত্যু! মৃত্যুর জন্যেই প্রস্তুত হলাম আমি।

হান্স্ আমার দিকে চেয়ে শুকনো হাসি হাসল। আবার কান পাতল দেয়ালের গায়ে। শোনার চেষ্টা করল অদেখা ঝরনার কল্লোল। তারপর ওর বিরাট গাঁইতিটা তুলে নিয়ে একমনে পাথরে আঘাত করে চলল। এক ঘণ্টা কেটে গেল। তখনও পাথরে আঘাত করে চলেছে সে। শেষে ছোটকাকাও হাত লাগালেন।

আরও সময় কাটল। হঠাৎ তীব্র সোঁ সোঁ শব্দে একটা পানির ধারা আছড়ে পড়ল অন্য পাশের দেয়ালে। জলের আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল হান্স্।

পানি ছুঁয়ে দেখলাম আগুনের মত গরম, প্রায় ফুটন্ত। উষ্ণ বাষ্পে ভরে গেল সুড়ঙ্গ। বাধা মুক্ত উত্তপ্ত জলধারা পাতালের দিকে তীব্র বেগে ধেয়ে গেল।

সে পানি অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা করে পান করলাম। অমৃতের মত লাগল সেটাই। আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস কমলে ছোটকাকা বললেন, 'আজ থেকে এর নাম রাখলাম হান্স্ নদী।'

বিনা দ্বিধায় ছোটকাকার কথায় সায় দিলাম আমি। হান্স্ তখনও নির্বিকার, যেন কিছুই হয়নি। একপাশে বসে সেই পানির দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

ছোটকাকাকে বললাম, 'এভাবে পানি নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না আমাদের। বোতলগুলো ভরে নিয়ে দেয়ালের ফাটলটা বন্ধ করে দেয়া উচিত।'

হাসলেন ছোটকাকা, 'ভয় নেই। এ উৎসধারা অফুরন্ত। পানি যেমন যাচ্ছে, যাক। নিচেই তো যাচ্ছে। আমরাও নিচেই যাচ্ছি। এই স্রোতের অনুসরণ করলে পথ হারানোর ভয়ও থাকবে না, পানিরও অভাব হবে না।'

'যদি উৎস ফুরিয়ে যায়?'

ঘাড় নেড়ে বললেন ছোটকাকা, 'যাবে না। স্রোত দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এর উৎস অনেক উপরে—এ উৎস ফুরাবে না।'

খুশি মনে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলাম। অনেক দিন পর আজ ভাল করে খেয়েদেয়ে ঘুমানো যাবে।

আর ওদিকে বিনে পয়সার পথ প্রদর্শকের মত অন্ধকার পাতালের দিকে ছুটে যাচ্ছে তীব্র পানির স্রোত।

দশ

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার নিচে নামতে লাগলাম আমরা। সাপের মত এঁকে

বেঁকে এগিয়ে গেছে পথ। পায়ের তলায় কুল কুল করে বয়ে চলেছে পানি।

হঠাৎ সামনে পড়ল প্রকাণ্ড এক গহ্বর। গহ্বরের মধ্যে দিয়ে সোজা নিচে নেমে গেছে রাস্তা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন ছোটকাকা।

দড়ি বের করে আমাদের কোমরে বাঁধল হান্স্। যদি কেউ পড়েও যায়, অন্য দু'জনের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে পারবে সে। উনিশে জুলাই থেকে সাতাশে জুলাই পর্যন্ত একটানা নিচে নেমে চললাম আমরা। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের যেন শেষ নেই।

ছোটকাকা বললেন, 'আমরা এখন কোথায় জানিস? আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমাদের মাথার উপরে বিশাল আটলান্টিক? অসম্ভব।'

'কে বলেছে অসম্ভব? সত্যিই আমরা এখন আটলান্টিকের নিচে। এত নিচে যে আমাদের কাছে সবই সমান।'

উনত্রিশে জুলাই সাঁঝের বেলা একটা বিশাল গুহায় প্রবেশ করলাম। সেখানেই রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার যাত্রার প্রস্তুতি চলল। গ্র্যানাইটের মেঝের উপরে তখনও বয়ে চলেছে পানির স্রোত।

ছোটকাকা হিসাব করতে করতে বললেন, 'আজ পর্যন্ত মোট একশো পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা। মাথার উপর এখন গর্জাচ্ছে আটলান্টিক। হয়তো এখন সমুদ্রের উপরে চলছে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত—উন্মাদ হয়ে নাচছে ঢেউ—হয়তো কোন জাহাজ ডুবতে ডুবতে চলেছে—হয়তো—'

ছোটকাকার 'হয়তো' ফুরাবে না দেখে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোটকাকা, ঠিক কতটা নিচে এখন আমরা?'

হিসাব করে ছোটকাকা বললেন, 'আটচল্লিশ মাইল। এত নিচে নেমেছি, অথচ দ্যাখ, কানের পর্দায় সামান্য একটু চাপ ছাড়া কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাও দেখবি সহ্য হয়ে যাবে।'

আরও নিচে নেমে চললাম। পথ কোথাও ঢালু, কোথাও আবার সোজা নেমে গেছে নিচে—হয়তো আরেক পৃথিবীতে। একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত নেমেই চললাম, কিন্তু পথের শেষ হলো না।

সাতই আগস্ট। আমি চলছি সকলের আগে। পেছনে ছোটকাকা আর হান্স্। ছোটকাকা আর আমার হাতে একটা করে টর্চ। পথের দু'পাশ দেখতে দেখতে চলেছি আমি। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই খেয়াল করলাম, আমি একলা। আশ পাশে কোথাও খুঁজে পেলাম না ছোটকাকা আর হান্স্কে। কোন সাড়াশব্দও নেই। ফিরে চললাম আবার যে পথে এসেছিলাম। অনেক ঘুরেও ছোটকাকা বা হান্সের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ওদের খুঁজে না পাওয়ার মানে সহজেই বুঝলাম। ভয়ে ছম ছম করে উঠল গা-টা। বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। সংবিৎ ফিরতেই চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করলাম ছোটকাকাকে। কিন্তু নিজ কণ্ঠস্বরের কর্কশ প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

এ পাতালের একটিমাত্র পথ—হারালাম কি করে আমি? হঠাৎ মনে পড়ল পানির সেই ধারার কথা। ওই রেখা ধরে হাঁটলেই তো সেই গুহাটায় পৌঁছানো

যাবে।

হেঁট হয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিতে গেলাম। তখনই সমস্ত আশা ভরসা কর্পূরের মত উবে গেল। পথে চিহ্ন মাত্র নেই পানির। শুধু গ্র্যানাইটগুলো শুকনো দাঁত বের করে ব্যঙ্গ করতে লাগল আমাকে।

মেরুদণ্ড বেয়ে শির শির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা আতঙ্ক। চিন্তা করবার শক্তি রইল না। পণ্ডিতদের ভাষায় এটাই হয়তো জীবন্ত সমাধি। অসহ্য নীরবতা নিঃশব্দ হাসিতে টিটকারি মারতে লাগল আমাকে। ঝিম ঝিম করতে লাগল সমস্ত চেতনা।

এখন কি করে ছোটকাকা আর হান্‌সের সন্ধান পাওয়া যায়? মনে পড়ল পৃথিবীর আলো হাওয়ার কথা, সবুজ বন আর নীল সাগরের কথা, হ্যামবুর্গের ছোট্ট পুরানো বাড়িটা আর গ্রোবেনের কথা। বেদনায় টন টন করে উঠল বুকটা। সেই শ্যামল পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব?

মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম। তিন দিনের উপযোগী খাবার আছে আমার সঙ্গে আর আছে এক বোতল পানি। তার মানে তিনটে দিন অন্তত বেঁচে থাকতে পারব আমি। ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পানির স্রোতটা খুঁজে বের করতে হবে, বের করতে হবে স্নেফেলে যাওয়ার পথ।

আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। পথের চেহারা, দেয়ালের রঙ, পাথরের কুচি দেখে পথ চেনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। তবু এগিয়ে চললাম, চলতে চলতেই ধাক্কা খেলাম কি একটাতে। হাত বাড়িয়েই টের পেলাম সামনে নিরেট পাথরের দেয়াল।

আর কোন আশা নেই। অসহায় ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই। নিরাশায় পাগলের মত মেঝেয় মুখ ঘষতে লাগলাম। চেঁচিয়ে শেষবারের মত ছোটকাকাকে ডাকার চেষ্টা করলাম—শব্দ বেরোল না গলা দিয়ে।

নিস্তেজ হয়ে আসছে টর্চের আলো। অল্পক্ষণ আয়ু আছে আর ব্যাটারির। শূন্য চোখে শেষ হয়ে আসা আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চারপাশে কারা যেন ছায়ার মত নাচছে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে ক্রমশ। যেন পিষে মারবে আমাকে। এক সময় দপ করে নিভে গেল আলো।

অন্ধকার। চারপাশে গভীর, তীক্ষ্ণ, ঘন অন্ধকার—সে অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়। জড়ানো যায় হাতে। ভয়ে শির শির করে উঠল গা। মরি যদি, আলোয় যেন মরি। আলো চাই, শুধু একটু আলো—।

কখন জ্ঞান হারিয়েছি বলতে পারব না। জ্ঞান ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে আছাড় খেলাম কতবার। মাথা ঠুকে গেল মেঝেতে, দেয়ালে। টের পেলাম কপালের কাছটা ফেটে গিয়ে চট চট করছে আঠাল রক্তে। তবু ছুটতে থাকলাম উন্মাদের মত। আবার একবার মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। আবার জ্ঞান হারালাম।

দূরে—বহু দূরে, বজ্রগর্জনের মত একটা শব্দ শুনতে শুনতে জেগে উঠলাম। শব্দটা কিসের বুঝলাম না। উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। মিনিট কয়েক পরেই থেমে গেল সেই আশ্চর্য শব্দ। পাগল হয়ে যাচ্ছি কি, তাই কি ওই শব্দের সৃষ্টি হয়েছে মগজের শিরা উপশিরায়?

আবার শোনা যাচ্ছে শব্দটা। এবার অন্যরকম। কথা বলার শব্দ। কিন্তু কারা? কারা কথা বলছে দেয়ালের ও পাশে? মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাঁচাও, বাঁচাও!'

উত্তর এল না। অনেকক্ষণ পর আবার কথা বলার আওয়াজ শোনা গেল। পরমুহূর্তে ভীষণ শব্দে ছেয়ে গেল চারদিক। তারপর থেকে বার বার ঘটল ঘটনা। প্রতিবার কথার আওয়াজ শোনার একটু পরই শোনা যেতে লাগল বজ্রের মত শব্দ।

হঠাৎ বজ্রধ্বনির ভেতর শুনতে পেলাম আমার নাম। এবার বুঝলাম ব্যাপারটা। তারের মধ্যে দিয়ে যেভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়, তেমনি শব্দ আসছে ওই দেয়ালের ভেতর দিয়ে। আমার কথা ওদের শোনাতে হলে এই দেয়ালে মুখ লাগিয়ে চেঁচাতে হবে। দেয়ালে মুখ রেখে ডাকলাম, 'ছো-ট কা-কা!'

উত্তরের অপেক্ষা করে রইলাম। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। অবশেষে কানে এল ছোটকাকার গলা, 'অ্যাকজেল, একি তুই? কোথায় আছিস এখন তুই?'

'ছোটকাকা, আমি অ্যাকজেল। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আলোটাও নিভে গেছে।'

'পানির স্রোতটার কি হলো?'

'খুঁজে পাচ্ছি না।'

'হুঁ! ভয় নেই। গ্যালারির পথে অনেক খুঁজেছি তোকে, নাম ধরে ডেকেছি, এমন কি বন্দুকের আওয়াজও করেছি। আরেকটু সাহস রাখ, অ্যাকজেল। পরস্পরের কথা শোনা যাচ্ছে, অথচ কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়? দাঁড়া, একটু চিন্তা করে দেখি।'

'ছোটকাকা, আমাদের মধ্যে দূরত্ব কতখানি বলতে পারো?'

'ফসফরাস দেয়া ক্রনোমিটারটা আছে না তোর কাছে? এক কাজ কর। ঘড়ি ধরে আমার নাম উচ্চারণ কর, আমিও ঘড়ি ধরে শুনছি। খেয়াল রাখ কত সময় লাগে আমার কথা শুনতে। হ্যাঁ, এবার ডাক তো।'

দেয়ালে মুখ রেখে ছোটকাকাকে ডাকলাম। একটু পরই শুনতে পেলাম আমার নাম।

জিজ্ঞেস করলেন ছোটকাকা, 'কত সময় লাগল?'

'চল্লিশ সেকেন্ড।'

'তাহলে শব্দ আসতে লেগেছে ঠিক বিশ সেকেন্ড।' বললেন ছোটকাকা, 'শব্দের গতি সেকেন্ডে এগারোশো বিশ ফুট। তাহলে বিশ সেকেন্ডে হয় বাইশ হাজার চারশো ফুট। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ব্যবধান হলো প্রায় সোয়া চার মাইল।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সোয়া চার মাইল!'

'তাই। এক কাজ কর। নিচের দিকে নামতে থাক, শিগ্‌গিরই আমাদের দেখা পাবি। হ্যাঁ, শুরু কর এবার।'

রওনা হয়ে গেলাম। পা চলতে চাইছে না, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, তবু সেই ঢালু পথ ধরে এগিয়ে চললাম। কোন কোন জায়গায় পথ এত ঢালু, হাঁটতেই হলো না—কে যেন ঠেলে নামাতে থাকল আমাকে। কুয়ার মধ্যে দিয়ে নামছি যেন।

ক্রমশ তীব্র হতে লাগল গতি। চেষ্টা করেও ধীর করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বহু নিচের একটা পাথরে আছড়ে পড়লাম। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল পৃথিবী। তৃতীয়বার জ্ঞান হারালাম সেদিন।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম একটা কম্বলের উপর শুয়ে আছি। ছোটকাকা আমার উপর ঝুঁকে পড়ে হাতের নাড়ি দেখছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে উল্লাসে শিশুর মত চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। ক্ষীণভাবে হাসার চেষ্টা করলাম, 'আমরা কোথায় এখন?'

'এখন আর কথা না। ঘুমিয়ে থাক।'

সাংঘাতিক রকম দুর্বল হয়ে পড়েছি তখন। তাই আর কথা না বলে পাশ ফিরে চোখ বুজলাম।

ঘুম ভাঙল পরদিন ভোরে। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে চারদিক। দূরে, বহু দূরে, ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেলাভূমির উপরে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। হতভম্ব হয়ে গেলাম, স্বপ্ন, না সত্যি?

না, স্বপ্ন তো নয়! স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ঢেউয়ের শব্দ। তবে কি—।

ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে?'

'ভাল। কিন্তু ও কিসের শব্দ? আর এত উজ্জ্বল আলো আসছে কোত্থেকে?'

'সব বুঝতে পারবি। শুধু আজকের দিনটা ধৈর্য ধর। এখুনি খোলা হাওয়া লাগলে অসুখ করতে পারে।'

চমকে উঠলাম, 'খোলা হাওয়া? বলছ কি তুমি?'

'ঠিক বলছি। হাওয়া এখন প্রবল। এ অবস্থায় তোর চলাফেরা করা ঠিক হবে না। আজকের দিনটা জিরিয়ে নে। নইলে সাগর পাড়ি দেয়ার সময় আবার অসুখে পড়বি তুই।'

থ হয়ে গেলাম। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। কথা শুনে সমস্ত ক্লান্তি চলে গেছে শরীর থেকে। ছোটকাকার পিছু পিছু এগোলাম।

একটু পরই দিগন্ত বিস্তৃত চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে এলাম। সহ্য হলো না এত আলো, অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বুজে এল। আধ বোজা চোখেই যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হলো, 'সমুদ্র!'

'হ্যাঁ, সমুদ্র।' বললেন ছোটকাকা, 'এ সাগরের নাম আমার নিজের নামেই দিয়েছি, লিডেনব্রক সী।'

নীল সাগরের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির সোনালী বালিতে, আর সেই সোনালী বালির প্রান্তদেশে চিক চিক করছে ঢেউয়ের রূপালী ফেনা। সমুদ্রই। তবে এ অন্য পৃথিবী— পাতালের। কেমন একটু নিষ্প্রাণ। চারদিকের উজ্জ্বল আলো সূর্য বা চাঁদ থেকে আসছে না। অরোরা বোরিয়ালিসের মত এও এক প্রকারের বৈদ্যুতিক আলো।

নিঃসীম শূন্যে মেঘ করেছে তখন। যে কোন মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে, বিস্ফারিত চোখে এই অলৌকিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এ পৃথিবী, না অন্য গ্রহ? পাথরের অন্ধকার গহ্বরে সাতচল্লিশ দিন কাটানোর পর এই উন্মুক্ত বাতাস আর সুনীল সাগর দেখে আশার সঞ্চার হলো মনে। শক্তি ফিরে পেলাম

দেহে।

উপকূল ধরে হাঁটতে লাগলাম ছোটকাকার সঙ্গে। আঁকাবাঁকা উপকূলে শুধু পাথর আর পাথর। কোথাও পাহাড়ের ফাটলে বয়ে যাচ্ছে ঝরনা, কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উঠছে গরম ভাপ।

সামনে গভীর জঙ্গল। সে জঙ্গলের ভেতর ঢুকতেই শীত শীত করতে লাগল। পায়ের তলায় মাটি ভেজা ভেজা। আধ ঘণ্টা পর জঙ্গল পেরিয়ে আবার সাগর তীরে বেরিয়ে এলাম। সামনে আর একটা জঙ্গল। বিশাল সব গাছ, একশো থেকে দেড়শো ফুট উঁচু। এখানে ওখানে পড়ে আছে জন্তু-জানোয়ারের সাদা কঙ্কাল। অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে এলাম জঙ্গল থেকে। ছোটকাকা আমাকে তাঁবুতে নিয়ে চললেন। এটুকু হেঁটেই ক্লান্তিতে ছেয়ে গেল শরীর। তাঁবুতে পৌঁছেই শুয়ে পড়লাম সটান।

পরদিন সকালে ঠিক করলাম, অনেকদিন গোসল করা হয়নি, আজ সমুদ্র স্নান করব। সাগরের কাকচক্ষু জলে গোসল করে ওঠার পর ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। প্রচণ্ড খিদে পেল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম।

একটু পর ছোটকাকা জানালেন, 'এবার জোয়ার আসবে সাগরে।'

'এ সাগরেও জোয়ার-ভাটা হবে? আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যের কিছু নেই। পৃথিবীর সব জিনিসই তো অভিকর্ষের অধীন।'

'ছোটকাকা, আমরা কোথায় এখন বলতে পারো?'

'আইসল্যান্ড থেকে প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দক্ষিণ পুবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে কতটা নিচে নেমেছি জানিস? প্রায় একশো দশ মাইল। আমাদের মাথার উপর হয় স্কটল্যান্ড, নয় ইংল্যান্ড।' একটু থেমে বললেন, 'আমাদের এখন এ-সাগর পেরোনোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সাগর পেরোবে?' অবাক হলাম আমি, 'কি করে? জাহাজ কই?'

'জাহাজ বা নৌকা করে পেরোবার কথা তো বলিনি। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ভেলা বানিয়ে নেব।'

'তাহলে তো গাছ কাটতে হয়।'

'কাটা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চল, দেখবি।'

মাইলখানেক দূরে গিয়ে দেখলাম, হান্‌স্ কাঠের টুকরা আর গুঁড়ি দিয়ে ভেলা বানাচ্ছে।

পরদিন সন্ধ্যায় ভেলা বানানো শেষ হলো। বেশ মজবুত হয়েছে ভেলাটা। লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ। তিনজনে ঠেলে ভেলাটা পানিতে নামালাম। পানির উপর বেশ সুন্দর দেখাল ওটা। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। হান্‌স্ দড়ি দিয়ে ভেলাটাকে একটা পাথরের সঙ্গে বাঁধল। কাল সকালে এ ভেলায় চড়েই আমরা পাড়ি দেব এই অথৈ সমুদ্র।

এগারো

তেইশে আগস্ট সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হলো অজানা সাগরে। পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে বসল হান্‌স্। অনুকূল হাওয়া আর স্রোতের টানে টানে তর-তর করে এগিয়ে চলল ভেলা।

ছোটকাকা বললেন, 'যেখান থেকে ভেলা ভাসালাম, সে বন্দরটার একটা নাম দেয়া উচিত। কি নাম দেয়া যায় বলত?'

'কেন? পোর্ট গ্রোবেন দিলে হয় না?'

'ঠিক।' হাসলেন ছোটকাকা, 'পোর্ট গ্রোবেনই দেয়া যাক। গ্রোবেনকে তোর খুব ভাল লাগে, না?'

এ নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরোবার পর থেকে কেন জানি গ্রোবেনকে খুব বেশি মনে পড়ছিল।

চব্বিশে আগস্ট, শুক্রবার। বাতাস বেশ শান্ত। শান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে আমাদের ভেলা। সামনে, দু'পাশে, পেছনে চারদিকে শুধু পানি আর পানি।

দুপুরে হান্‌স্ নিজের মালপত্র থেকে একটা ছিপ বের করে নিল। বুদ্ধি করে আসার সময়ই একটা ছিপ নিয়েছিলেন ছোটকাকা। বড়শিতে মাংসের টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে বসে রইল সে। ঘণ্টা দু'য়েক পর সত্যি সত্যি টান পড়ল ছিপে। তক্ষুণি ছিপ তুলল হান্‌স্। ছটফট করছে বড়শিতে গাঁথা অদ্ভুত চেহারার মাছটা।

মাথাটা তার আশ্চর্য রকম চ্যাপ্টা, মুখটা গোল, বন রুইয়ের মত শক্ত আঁশ। মুখে দাঁত নেই, পেছনে লেজও নেই। ছোটকাকা বললেন, 'এ যুগের মাছ না এটা। বিজ্ঞানীদের মতে কোটি কোটি বছর আগেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে এরা। চেয়ে দ্যাখ, চোখ নেই মাছটার। জীব বিজ্ঞানে তিনটা নাম দেয়া হয়েছে এর—গ্যানোঅ্যাড, শ্যেফালাসপিডে আর টেরিকথ্যিস।'

অবাক চোখে এই নিদন্ত বেনামী অদ্ভুত মাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবার ছিপ ফেলল হান্‌স্। দেখতে দেখতে ওইরকমের এবং আরও অন্যান্য ধরনের প্রায় বিশটা মাছ ধরে ফেলল সে। ছোটকাকা যত্ন করে সেগুলো স্টাফ করার ব্যবস্থা করলেন।

পানিতে এত মাছ, কিন্তু আশ্চর্য, আকাশে একটা পাখিও নেই।

ছাব্বিশে আগস্ট, রবিবার। কাল সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, শুধু আকাশটা একটু মেঘলা ছিল। আজ আকাশ একদম পরিষ্কার।

সাগরের কূল চোখে পড়ল না। অত্যন্ত উত্তেজিত ছোটকাকা, শেষ নেই বলে সাগরের উপর খেপে গেছেন তিনি। একটা প্রশ্ন দেখা দিল মনে। সাক্‌ন্যুউজম সমুদ্র পথে এসেছিলেন কি?

আটাশে আগস্ট, মঙ্গলবার। কাল বিকাল থেকে ভীষণ আলোড়ন চলছে সাগর জলে। সতর্ক হাতে ভেলাটাকে সামলেছে হান্‌স্। সমুদ্রের শেষ দেখা যাচ্ছে না

এখনও। সন্ধ্যার দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আমার দুঃস্বপ্ন ভরা ঘুম ভেঙে গেল। ভেলার এক কোণ থেকে ছিটকে এসে অন্য কোণে পড়লাম। কি কারণে সমুদ্র এমন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে?

সাঁঝের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম ছ'শো গজ দূরে প্রকাণ্ড কালো একটা কি যেন ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করছে। একটু পরই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ডলফিন! এ যে দানবীয় ডলফিন!'

ছোটকাকাও আমার মত চেঁচাতে লাগলেন, 'শুধু তাই নয়। ওদিকে দ্যাখ। বিশাল এক কুমীর! মুখের হা আর চোয়ালের বহর দেখেছিস?'

'ওই দেখো, ছোটকাকা, এক সী লিজার্ড—অনায়াসে আমাদের মত জনাপঞ্চাশকে গিলে ফেলতে পারে!'

'তিমিটার কাণ্ড দেখ। পানিতে টর্নেডো বইয়ে দিচ্ছে!'

এতগুলো অতিকায় জলজন্তু দেখে বিস্ময়ে প্রায় বোবা হয়ে গেলাম। চারদিকে আরও সব দানব ভেসে উঠল। বিরাট চেহারা দেখেই বোঝা যায় কি অসম্ভব শক্তি আছে ওদের দেহে। সবচে ছোটটাও ইচ্ছে করলে আমাদের ভেলাটা গুঁড়িয়ে দিতে পারে এক লহমায়।

ভয়ানক সব জানোয়ারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় ভেলার মুখ ঘুরিয়ে দিল হান্‌স্। কিন্তু যেদিকেই ঘুরাক না কেন, পথ বন্ধ। কোথাও বা পঞ্চাশ ফুট ব্যাসের এক কচ্ছপ, কোথাও তারচে বেশি দৈর্ঘ্যের একটা সাপ ফণা তুলে লেজের ঝাপটায় তোলপাড় করছে পানি।

ভয়ে কাঠ হয়ে রইলাম। গুলি করে কোন লাভ হবে না। বন্দুকের গুলি এদের চামড়ায় বসবে না। হঠাৎ একটা সাপ আর একটা কুমীর হুস করে ভেলার দু'পাশে ভেসে উঠল। আর রেহাই নেই। কিন্তু ভেলা আক্রমণ না করে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। প্রাণপণে দাঁড় টেনে ওদের থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে ভেলাটাকে সরিয়ে নিল হান্‌স্। ওদিকে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিয়েছে দানব দুটো। ওদের লেজের ঝাপটায় ফুলে, ফেঁপে, দুলে উঠল সাগর। সাপটার চোখগুলো টকটকে লাল—মাথাটা মানুষের মাথার সমান। লম্বায় শ'খানেক ফুট হবে। কুমীরটার শরীরে লোহার মত কঠিন, কালো আঁশ। দৈর্ঘ্যে কম হবে না সাপটার চেয়ে । ওদের প্রচণ্ড দাপটে, উথাল পাতাল সাগরের বুকে প্রায় উল্টাতে উল্টাতে কোনমতে বেঁচে গেল আমাদের ভেলা।

লড়াইটা কতক্ষণ চলল বলা অসম্ভব । অনেক—অনেকক্ষণ পর ডুব দিল ওরা পানির নিচে। হঠাৎ আবার ভেসে উঠল সাপটার মাথা। কুমীরটা মরণ কামড় বসিয়েছে ওর গায়ে। কয়েক মিনিট যন্ত্রণায় ছটফট করল সাপটার মাথা, তারপর ডুবে গেল। কুমীরটাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত স্তব্ধ মনে হলো সাগরের পানিকে।

কপাল ভাল আমাদের। আমি তো বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আর একটুও দেরি না করে ভেলাটা অন্যদিকে নিয়ে গেলাম আমরা।

উনত্রিশে আগস্ট, বুধবার। আকাশে ঘন মেঘ। বার বার মেঘের বক চিরে

ঝিলিক হানছে বিদ্যুৎ। বিকেল চারটায় মাস্তুলের উপর উঠে গেল হান্‌স্। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল। একটা দিকে বেশ অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখল সে। হঠাৎ সেদিকে আঙুল তুলে অবাক গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, ওই দেখুন!'

তক্ষুণি দূরবীনে নির্দেশিত দিকে তাকালেন ছোটকাকা। তারপর বললেন, 'তাই তো!'

বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি? নতুন কোন জানোয়ার নাকি?'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'দেরি না করে অন্যদিকে ভাসিয়ে নিতে হবে ভেলাটা।'

অতিকায় জিনিসটা তখন ভেলা থেকে কয়েক মাইল দূরে। তিমির মত শূন্যে পানির ফোয়ারা ছুঁড়ছিল ওটা।

হান্‌স্ ওটার দিকেই সোজাসুজি ভেলা চালাতে শুরু করল। হাজার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমার কথায় কান দিল না সে। এত সব কাণ্ড কারখানা দেখে পাগল হয়ে গেল নাকি ও? আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল ফোয়ারা আর জন্তুটার কুচকুচে কালো শরীর। জানোয়ারটাকে উদ্দেশ্য করে আইসল্যান্ডের ভাষায় কি যেন বলল হান্‌স্।

হান্‌সের কথায় অবাক হলেন ছোটকাকা, 'দ্বীপ! বলছ কি তুমি?'

আর সন্দেহ রইল না আমার। পাগলই হয়ে গেছে হান্‌স্। কিন্তু একটু পরই ছোটকাকার গলা শোনা গেল, 'ঠিকই বলেছে হান্‌স্। দ্বীপই ওটা। পানির ফোয়ারাটা আসলে উষ্ণ প্রস্রবণ।'

আরও স্পষ্ট হলো দ্বীপটা। অপূর্ব দেখাচ্ছে উষ্ণ প্রস্রবণটাকে। দ্বীপের গড়নও অদ্ভুত। দূর থেকে দেখলে মনে হয় অতিকায় একটা জানোয়ার জলের উপর ভাসছে। সবচে আশ্চর্য ব্যাপার, ফোয়ারাটার চারপাশে বার বার ঝিলিক মারছে নীল রঙের বিদ্যুৎ।

প্রস্রবণটার উল্টোদিকে ভেলাটাকে বাঁধা হলো। গ্র্যানাইটের দ্বীপ। স্টীম ইঞ্জিনের বয়লারের মত থর থর করে কাঁপছে দ্বীপটা। অনুমান করলাম দ্বীপটা ফাঁপা। ভেতরটা গরম বাষ্পে ভরা।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ভেলায় ফিরলাম। পানির ঝাপটায় খারাপ হয়ে যাওয়া হালটা ইতিমধ্যে মেরামত করে নিয়েছে হান্‌স্। ভেলায় উঠে প্রস্রবণটার দিকে তাকালাম। অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। ফোয়ারার পানি প্রথমে খুব জোরে উঠছে, তারপর উঠছে একেবারে আস্তে—ইঞ্জিনের ভাল্‌ভ্ থেকে বলকে বলকে বাষ্প বেরোনোর মত।

লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বুঝলাম এটা ভয়াবহ এক আগ্নেয়দ্বীপ।

রাতেই ভেলা ছাড়লাম আমরা। সারারাত অজানা সাগরে পাড়ি জমালাম। পরদিন ভোরে প্রস্রবণটা চোখে পড়ল না আর।

জোরাল হাওয়ায় ফুলে উঠেছে পাল। তীরবেগে ছুটে চলছে ভেলা। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বার বার। মেঘের নিবিড় রঙ দেখে বোঝা গেল, শিগগিরই উঠবে ভীষণ ঝড়। এ ঝড় পরিচিত পৃথিবীর ঝড় নয়। খানিকক্ষণ ধুলোবালি উড়িয়ে, গাছ পালা ভেঙে, চারদিক লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে থেমে যাবার ঝড় এ নয়। এ

হলো বিদ্যুতের তাণ্ডব লীলা।

ধারণাটা মিথ্যে নয়। একটু পরই দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল আমাদের। সারা শরীরে চলল কিসের উন্মাদ নৃত্য! শিরায় উপশিরায় চঞ্চল হয়ে উঠল রক্ত। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়। মনে হতে লাগল এখন কেউ আমাকে ছোঁয়া মাত্র ইলেকট্রিক শক্ খাবে। প্রবল বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যেতে থাকল শরীরে, অথচ মারা গেলাম না আমি।

বাতাসের বেগ বেড়ে চলল। আকাশের দিকে চেয়ে মনে হলো, মেঘের দল ফেটে যাবে এখনই, তারপর ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসবে আগুনের লেলিহান শিখা।

ছোটকাকা আর হান্সের দিকে চেয়ে বুঝলাম ওঁদের অবস্থা আমার মতই।

ঠিক এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামল! প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে এল ঝড়। ঝড়ের পাল্লায় পড়ে ভেলার মুখ গেল ঘুরে। পাগলের মত নাচানাচি শুরু করল ওটা। ছোটকাকা আর আমি ভেলার উপর কাত হয়ে পড়ে গেলাম। হান্স্ কোনমতে হাল আঁকড়ে বসে রইল। হাওয়ায় চুল উড়ছে তার, চুলের ডগায় জ্বলছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের মতই তখন ছুটতে শুরু করেছে ভেলাটা।

দোসরা সেপ্টেম্বর, রবিবার। ঝড়ের তাণ্ডব কমেনি আজও। আগের মতই তীব্র গতিতে ছুটছে ভেলা। তিনজনেই অনড় পড়ে আছি ভেলার উপর। সকালের দিকে জ্ঞান ফিরে এসেছে একবার। টের পেলাম নাক কান দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। শেষে বোধশক্তি পর্যন্ত সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল।

তেসরা সেপ্টেম্বর, সোমবার। আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে ঝড়। উন্মাদ সাগরের পানিতে হুহু করে ছুটছে ভেলা। ভেলাটা এখনও ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না কেন বুঝলাম না। তিন দিন ধরে খাওয়া, ঘুম, কথা বলা—সব বন্ধ। আমরা যেন সত্যিই মৃত।

এমন সময় ঘটল সবচে আজব ঘটনাটা। দূর থেকে নক্ষত্রবেগে গোল একটা আগুনের গোলা এসে পড়ল ভেলার উপর। তারপর কি ঘটতে লাগল ঠিক বুঝলাম না। আধো চেতন অবস্থায় মনে হলো বলটার রঙ উজ্জ্বল সাদা, তাতে নীলের ঈষৎ আভাস। ভেলার উপর তীব্র বেগে ছুটোছুটি করছে বলটা। মাস্তুল, পাল, ছই সব উড়ে গেল। কখনও ছোটকাকার দিকে, কখনও হান্সের দিকে, কখনও বা আমার দিকে ছুটে আসছে বলটা। ভয়াবহ, নীলাভ উজ্জ্বল, উত্তপ্ত বলটার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। বলটা পড়ার সাথে সাথে কি এক আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতায় ভেলার উপরের সমস্ত লোহার জিনিসগুলো একে অন্যকে আঘাত করতে শুরু করেছে। একসময় সেই অগ্নিপিণ্ড কান ফাটানো আওয়াজ করে চুরমার হয়ে গেল। চারদিকে ছুটতে লাগল আগুনের ফুলকি। উগ্র নাইট্রোজেন গ্যাসে ভরে গেল চারদিক। তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে।

একটু ধাতস্থ হয়ে চোখ মেলে দেখলাম বলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভেলার উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ছোটকাকা। হিস্টিরিয়া রোগীর মত মৃত চোখে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে হান্স্।

চৌঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। সকাল হতে দেখলাম আকাশ তখনও নিবিড় মেঘে

অন্ধকার। এরই মাঝে হিসাব করে নিস্তেজ গলায় জানালেন ছোটকাকা, আমরা জার্মানির ঠিক নিচে। বাড়ির কথা, মার্থা-গ্রোবেনের কথা মনে পড়ল আমার। ঠিক তখনই কানে এল একটা ভয়ঙ্কর শব্দ।

কি হলো বুঝে ওঠার আগেই প্রবল বেগে ভেলা থেকে ছিটকে পড়লাম সাগরের পানিতে। প্রায় সাথে সাথেই লাফ দিল হান্‌স্। জ্ঞান হারাবার আগে টের পেলাম সবল দুটো হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম ডাঙায় শুয়ে আছি।

আমি চোখ খুলতেই ছোটকাকা বললেন, 'হতচ্ছাড়া এই সমুদ্র যাত্রাটা শেষ হলো তাহলে। উহ্, বাঁচা গেল! এবার আরও নিচে নামতে হবে আমাদের ।'

বললাম, 'ছোটকাকা, দিনের পর দিন তো এগিয়েই চলেছি, ফিরব কবে? কি করে?'

হাসলেন ছোটকাকা, 'জায়গা মত পৌছাই আগে, তার পর ফেরার কথা ভাবা যাবে। চল, ভেলাটার অবস্থা দেখে আসি।'

ভেলায় পৌছে দেখলাম বেশির ভাগ খাবারই ভেসে গেছে। অকেজো হয়ে গেছে বন্দুকগুলো। মেরামতের বাইরে চলে গেছে ভেলার অবস্থা। যন্ত্রপাতির মধ্যে কম্পাসটা হাতে তুলে নিলেন ছোটকাকা। সাথে সাথে চোখমুখের ভাব বদলে গেল ওঁর! অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাতেই নীরবে কম্পাসটা আমার হাতে তুলে দিলেন। আশ্চর্য! যেদিকটা দক্ষিণ বলে ভেবেছি, কম্পাসের কাঁটা সেটাকে উত্তর নির্দেশ করছে।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলেন ছোটকাকা। তারপর নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপতে শুরু করলেন । সামনে না এগিয়ে পিছিয়ে চলেছি আমরা এত দিন। নিয়তির এ কি নির্মম পরিহাস!

একটু পরই নিজেকে সামলে নিলেন ছোটকাকা। শান্ত কণ্ঠে বললেন , 'আবার নতুন করে রওনা হব আমরা।'

থ হয়ে গেলাম আমি। কোনমতেই হাল ছেড়ে দেয়ার লোক নন ছোটকাকা।

হান্‌সে্‌র দিকে ফিরে শিগ্‌গির ভেলাটা ঠিক করে ফেলার নির্দেশ দিলেন ছোটকাকা। তারপর আমাকে বললেন, 'আয়, দ্বীপটা একবার ঘুরে আসা যাক।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম না। করলেও লাভ হত না। চুপচাপ ছোটকাকার সঙ্গে ঘুরতে বেরোলাম। সামনেই ছোট একটা টিলা। টিলাটা ছাড়িয়ে ঢালু জায়গা। রাশি রাশি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল পড়ে আছে সেখানে। যতই এগোলাম, কঙ্কালের সংখ্যা বেড়েই চলল। এদের অবস্থা দেখে বোঝা গেল হাজার হাজার বছর ধরে ওগুলো পড়ে আছে এখানে। চলতে চলতে হেঁট হয়ে সে সব কঙ্কাল গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন ছোটকাকা। বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাঁর চোখমুখ। সামনে এগিয়ে চললাম আমি। বড়জোর হাত পঞ্চাশেক এগিয়েছি এমন সময় ছোটকাকার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম, দু'হাতে একটা মানুষের মাথার খুলি নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'এ যে মানুষের মাথার খুলি!' কথাটা বলেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি।

বিজ্ঞানীরা যাই বলুক না কেন, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম কোটি কোটি বছর

আগে হাতি, গণ্ডার বা অন্যান্য স্থলচর প্রাণীর জন্মের আগেই জন্মেছিল মানুষ। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটকাকা আবার এগোতে লাগলেন। আমিও অনুসরণ করলাম তাঁকে। এসব দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। পশুদের কঙ্কালের সাথে অসংখ্য নরকঙ্কাল পড়ে আছে পথে। সেই কঙ্কাল ছড়ানো শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হলো মৃত্যু যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে আমাদের চারপাশে।

দু'মাইল হাঁটার পর বিশাল এক বনের কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাইন, বার্চ, সাইপ্রেস, ফার, ওক ইত্যাদি সব আকাশ ছোঁয়া গাছের সমারোহ সারা বনটাতে। গাছগুলো জীবিত কিন্তু একটু বিবর্ণ। হয়তো সূর্যালোকের অভাবই এর কারণ।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বনে ঢুকে গেলেন ছোটকাকা। বাধ্য হয়ে আমিও অনুসরণ করলাম। খানিকক্ষণ চলার পরই ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। ছোটকাকাকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলাম। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব।

প্রকাণ্ড সব অতিকায় হাতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে। আঠারোশো এক সালে ওডিওর ভূগর্ভ থেকে এজাতের একটা হাতির কঙ্কাল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে এরা আমাদের পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে বলেই জানতাম।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে অপলক চোখে হাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হঠাৎ ছোটকাকা হাত রাখলেন আমার কাঁধে। চমকে উঠে চাইলাম তাঁর তর্জনী নির্দেশিত দিকে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। সুস্থ মস্তিষ্ক কোন লোক একথা কল্পনা করতে পারবে না। আকাশ ছোঁয়া ওক গাছের নিচে জ্যান্ত একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ না বলে দানব বলাই উচিত। লম্বায় চওড়ায় আমাদের চারগুণ হবে। হাতে ছোটখাট একটা গাছ। বুঝলাম, হাতিগুলোর রাখাল সে। মাথায় এলোমেলো বড় বড় চুল। মুখের চেহারা অনেকটা মোষের মত।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। ছবির মত অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন ছোটকাকা, 'জলদি! এখুনি পালাতে হবে।'

জান বাজি রেখে ছুটতে শুরু করলাম। ভেলার কাছে পৌঁছুলে—যে হান্‌স্ কখনও অবাক হয় না—সে পর্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাকাল আমাদের দিকে। কথা বলার ক্ষমতা তখন নেই আমাদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। এই মাত্র যা দেখে এলাম, সে কি সত্যি, না বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা? সত্যিই কি পাতালের পৃথিবীতে আদিম সেই গুহা-মানবেরা আজও আদিম চেহারা নিয়েই বেঁচে আছে?

অনেকক্ষণ পর উত্তেজিত ভাবটা একটু কাটিয়ে উঠলাম। ছোটকাকা হিসেব করে জানালেন, পোর্ট গ্রোবেন আর বেশি দূরে নয়। ঝড়ে দিক ভুল করে আবার আগের দ্বীপেই ফিরে এসেছি আমরা। হান্‌স্‌কে নিয়ে তাই অন্য দিকে হেঁটে চললাম। যেভাবেই হোক, খুঁজে বের করতে হবে পোর্ট গ্রোবেন।

একটু দূরে বেলাভূমিতে চকচকে একটা জিনিস দেখে ছুটে গিয়ে তুলে নিলাম। একটা ছুরি। জায়গায় জায়গায় মরচে পড়া। ছোটকাকাকে দেখাতেই অবাক হয়ে

বললেন, 'কোত্থেকে এল এটা? এদিকে তো কখনও আসিনি আমরা! এরকম ছুরিও তো ছিল না আমাদের!' নেড়ে চেড়ে দেখলেন তিনি ছুরিটা, 'না, এ জিনিস আমাদের না। গড়ন দেখে মনে হচ্ছে অনেক আগের বানানো। তবে যত আগেরই হোক নিজে নিজে তো আর আসেনি এটা এখানে, কেউ নিয়ে এসেছিল।'

'কিন্তু কে সেই লোক?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ডগাটা কি রকম অসমানভাবে ক্ষয়ে গেছে, দেখেছিস? পাথরে ঘষার ফল এটা। কিন্তু ছুরির ডগা পাথরে ঘষবে কেন লোকে? হয়তো কিছু লেখার চেষ্টা করেছে কেউ। এখন কে, কি লিখেছে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।'

চারদিকে পাথরের গা পরীক্ষা করতে করতে এগোলাম। ঘণ্টাখানেক খোঁজার পর সাগর সৈকতের একটা পাথরের গায়ে দেখলাম দুটো অদ্ভুত হরফ খোদাই করা। অক্ষর দুটো দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন ছোটকাকা, 'আরে এ তো রুনিক হরফ! ইংরেজি করলে দাঁড়ায় এ, এস! তার মানে আর্ন সাকনুউজম!'

হরফ খোদাই করা পাথরটার পাশেই দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ-মুখ।

বারো

এই গভীর পাতালেও পাথরের গায়ে ছুরির মাথা দিয়ে নাম লিখে গেছেন সাকন্যুউজম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সাথে সাথে ভেলায় ফিরে গেলাম। যত দ্রুত সম্ভব ভেলাটা মেরামত করতে হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পানিতে ভাসিয়ে ভেলাটাকে সুড়ঙ্গের কাছাকাছি নিয়ে এলাম। উদ্দেশ্য, সুড়ঙ্গ অভিযানে কি কি লাগতে পারে তা সুড়ঙ্গে ঢুকে জেনে নিয়ে তারপর সঙ্গে নেব, আর বাকি জিনিসপত্র রেখে যাব ভেলাতেই।

তখুনি টর্চ জেলে সেই অজানা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে প্রবেশ করলাম। হান্স্ আর ছোটকাকা আমার পেছনে। এই অজানা পৃথিবীতে সাকন্যুউজমের খোদাইকৃত নাম দেখে আমার মনে উদ্দীপনার আলো জ্বলে উঠল। ছোটকাকার হিসাব মত পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছুতে তখনও সাড়ে চার হাজার মাইল বাকি। এসেছি যখন সবটাই দেখে যাব। এ সুড়ঙ্গই পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছার পথ। সুড়ঙ্গের বাইরে সাকন্যুউজমের নাম দেখেই তা বোঝা গেছে।

হাত চারেক চওড়া সুড়ঙ্গের দু'ধারে পাথরের কঠিন দেয়াল। আর একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। বিরাট এক পাথর পড়ে সামনের পথ বন্ধ। সে পাথর খালি হাতে সরানো একেবারে অসম্ভব।

সুড়ঙ্গের মেঝেতে বসে পড়ে ভাবতে শুরু করলাম। সাকন্যুউজম এখান থেকেই ফিরে যাননি। পাতালে নিশ্চয়ই পৌঁছেছিলেন, আর পৌঁছেছিলেন এ সুড়ঙ্গপথ ধরেই। তাঁর ফিরে আসার পর ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পাথর পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ আমার চোখে আশার আলো ঝিকিয়ে উঠল। বললাম,

'ছোটকাকা, বারুদ দিয়ে পাথরটা উড়িয়ে দেয়া যায় না?'

খুশি হয়ে উঠলেন ছোটকাকা, 'ঠিক বলেছিস!'

তখুনি বারুদ ঢালার জন্যে গর্ত খুঁড়তে শুরু করলাম। পঁচিশ সের বারুদে আগুন দেয়ার ব্যবস্থা করতে বেশ সময় লাগল। নাইট্রিক আর সালফিউরিক অ্যাসিডে তুলা ভিজিয়ে বারুদ তৈরি করে নিলাম। সাধারণ বারুদের চেয়ে এর শক্তি অনেক গুণ বেশি। গর্ত খুঁড়তে লাগল হান্‌স্‌। আমি আর ছোটকাকা সলতে বানাতে লাগলাম। গর্তটায় বারুদ ভরে সলতের একটা প্রান্ত ঢুকিয়ে দিলাম বারুদের ভেতর। অন্য প্রান্তটা বের করে নিয়ে এলাম সুড়ঙ্গের বাইরে। রাত হয়ে গেছে তখন। ছোটকাকা বললেন, 'আজ আর সলতেয় আগুন দিয়ে কাজ নেই । কাল সকালে দেয়া যাবে খন।'

পরদিন সকাল ছ'টায় তৈরি হয়ে আমরা সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ালাম। ছোটকাকাকে বলে সলতেয় আগুন দেয়ার দায়িত্ব নিলাম আমি। বার বার সতর্ক করে বললেন ছোটকাকা, 'সাবধান, একটা সেকেন্ডও দেরি করবি না। আগুন দিয়েই ছুটে চলে আসবি ভেলায় । পাহাড় কতখানি ধসে যাবে বলা মুশকিল। দশ মিনিটে সলতে বেয়ে আগুন পৌঁছে যাবে বারুদে । এটুকু সময়ের ভেতর ভেলায় করে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে।'

আমাকে এভাবে হুঁশিয়ার করে হান্‌স্‌ সহ ছোটকাকা গিয়ে ভেলায় উঠলেন। আগুন হাতে সলতের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোটকাকা চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন, 'রেডি, ফায়ার!'

হাতটা কাঁপল একবার । তারপরই আগুন লাগালাম সলতেয়, দপ্‌ করে জ্বলে উঠল সলতে । তীব্রবেগে অগ্নিশিখা ছুটে চলল সুড়ঙ্গের দিকে। একছুটে ভেলায় এসে উঠলাম। ছোটকাকা আর হান্‌স্‌ যত দ্রুত সম্ভব ভেলাটাকে চালিয়ে নিতে লাগল । তীর থেকে বড়জোর গজ চল্লিশেক গিয়েছি ঠিক তখনি কেঁপে উঠল চারদিক।

যেখানে পাথরটা ছিল মুহূর্তে সেখানে দেখা গেল এক অতল গহ্বর। ফুলে ফেঁপে উঠল সাগরের জল। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় তিনজনেই ছিটকে পড়লাম ভেলার উপর। গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে টের পেলাম ক্রমশ নিচে নামছি।

বিশাল পাথরের ওপারে ছিল অতল গহ্বর। বিস্ফোরণে পাথরটা গুঁড়িয়ে যাবার পর প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আর সাগরের জল জলপ্রপাতের মত গহ্বরে প্রবেশ করতে থাকে। স্রোতের সে প্রবল আকর্ষণে আমাদের ভেলাটাও রেহাই পায়নি। নিচে নামার সময় তীব্র স্রোত ভেলাটাকেও বয়ে নিয়ে চলল। দু'পাশের পাথরে বাড়ি খেয়ে ভেলার সাথে সাথে আমরাও গুঁড়ো হয়ে যাব।

প্রচণ্ড বেগে পাতালে নেমে চললাম। কিন্তু আশ্চর্য, একবারও পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেল না ভেলা। গহ্বরের বিস্তার বিরাট বলেই ঘটল না এমনটা। প্রবল বেগে পেছন থেকে ঝাপটা মারছে হাওয়া। সবচে গতিশীল যানের চেয়েও দ্রুত নামছি আমরা পাতালে। আমার টর্চ ভেঙে গেছে। অন্ধকারে গহ্বরের চেহারাটা দেখতে পেলাম না তাই।

অনেক—অনেকক্ষণ পর প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল ভেলাটা। তীব্র জলধারা

আছড়ে পড়ল আমাদের উপর। মিনিটখানেক থেমেই আবার চলতে শুরু করল ভেলা। কিন্তু পানির গর্জন শোনা গেল না আর।

ছোটকাকা বললেন, 'অ্যাকজেল, আমরা কিন্তু নামছি না, উঠছি।'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'উঠছি! কোথায় উঠছি? কি করে?'

'কি করে জানি না, কিন্তু সত্যিই উঠছি,' বললেন ছোটকাকা। 'কোনমতে যদি একটা আলো জ্বালা যায় তাহলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা।'

হান্‌সের টর্চটার কথা মনে ছিল না। আলোর কথা শুনেই টর্চটা জ্বালল হান্‌স্‌। আলো দেখে একটু আশার সঞ্চার হলো মনে।

ছোটকাকা বললেন, 'যা ভেবেছিলাম—গহবরের তলা ভরে যাওয়ায় অন্য পথে এখন উঠে যাচ্ছে পানি। হুঁশিয়ার-- যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। ঘন্টায় বোধ হয় মাইল দশেক বেগে উঠছি। যদি এ ভাবে উঠতে থাকি-- ।'

'আর যদি এ সুড়ঙ্গের কোন বহির্মুখ থাকে— ।'

'তাহলে তো ভালই । কিন্তু না থাকলেই হয়েছে। মরণ আর কেউ ঠেকাতে পারবে না,' বললেন ছোটকাকা। 'কিন্তু সে তো আরও পরের ব্যাপার। আয়, কিছু খেয়েনি এখন!'

একেই বলে সত্যিকারের পেটুক।

কিন্তু এতক্ষণ চেপে রেখেছিলাম খবরটা, আর রাখা গেল না। আগেই খেয়াল করেছি খাবারের পোঁটলাটা নেই ভেলায়। সব পড়ে গেছে পানিতে। খুঁজে পেতে এক আধ টুকরো শুকনো মাংস পাওয়া যেতে পারে হয়তো।

কথাটা শুনে শূন্য চোখে আমার দিকে তাকালেন ছোটকাকা। যেমন উঠছিলাম তেমনি উঠতে থাকলাম। অনুভব করলাম ক্রমশ তাপ বাড়ছে। হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন বুঝলাম না। এতদিন পাতালে কেটেছে, তবু এত উত্তাপ টের পাইনি কখনও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভয়ানক রকম বেড়ে গেল উত্তাপ। ছোটকাকাকে বললাম, 'বুঝেছ ছোটকাকা, ধরো নেহাত কপাল গুণে বেঁচে গেলাম ডুবে অথবা পাথরে ঘা খেয়ে মরার হাত থেকে, চাই কি খিদের হাত হতেও রেহাই পেয়ে যেতে পারি—কিন্তু পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচাবে কে!'

প্রথমবারের মত ভয়ের চিহ্ন দেখলাম ছোটকাকার চেহারায়। কথা বললেন না তিনি। ঠোঁট দুটো কাঁপল শুধু একবার।

আরও এক ঘণ্টা কাটল। আরও বেড়ে গেছে উত্তাপ। হঠাৎ হু হু করে বেড়ে গেল অনেকখানি। ভেলার গতিও বেড়ে গেল। চারপাশের পানি টগবগ করে ফুটতে লাগল। কিন্তু ক্রমশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তাপমাত্রা। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল । গন্ধকের উগ্র গন্ধে ভরে গেল চারপাশ। জ্বলন্ত চুল্লির মত গরম গহ্বরটা। ভুরু কুঁচকে গেছে ছোটকাকার, কপালে চিন্তার রেখা। সাংঘাতিক কোন দুর্ঘটনার পূর্বাভাস পাচ্ছেন যেন তিনি।

প্রমাণ পেলাম প্রায় সাথে সাথেই। টর্চের মৃদু আলোয় দেখলাম গহ্বরের দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। গ্যাস বেরুচ্ছে ফাটলগুলো থেকে। সেই মুহূর্তে শোনা গেল গম্ভীর গুরু গুরু গর্জন।

বিবর্ণ, নিরুত্তাপ হাসি ফুটল ছোটকাকার ঠোঁটে। বললেন, 'সুড়ঙ্গ পথে

অগ্ন্যুদগার শুরু হয়ে গেছে, অ্যাকজেল, এসব তারই অগ্রদূত। আগ্নেয়গিরির উদগার উপরে ঠেলে তুলছে আমাদের।'

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠলাম ভয়ে, 'তার মানে, ফুটন্ত তরল ধাতু—স্রোতের মাঝে এসে পড়েছি?'

আবার সেই প্রাণহীন হাসিটা দেখা গেল ছোটকাকার ঠোঁটে।

তীব্র বেগে উপরে উঠছে আমাদের ভেলা। পাথরের দেয়াল একবার ফাটছে, পরমুহূর্তে জোড়া লাগছে। সব শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সেই গম্ভীর গর্জন।

ভেলার প্রচণ্ড দ্রুততার জন্যে ঝলসে গেলাম না আমরা। হঠাৎ দেখলাম হান্‌সের সুগঠিত গ্রীক স্ট্যাচুর মত দেহ আগুনের লাল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার মাথার ভেতর একাকার হয়ে গেল জীবন আর মৃত্যু। পরক্ষণেই কে যেন আমাকে কামানের মুখে বেঁধে দেগে দিল কামানটা। উড়ে গেলাম মহাশূন্যে।

তেরো

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম হান্‌স্ এক হাতে আমাকে, অন্য হাতে ছোটকাকাকে ধরে রেখেছে। সামনের পাহাড়টা সোজা নেমে গেছে নিচে। হান্‌স্ ধরে না রাখলে সে পাহাড় থেকে পড়েই মারা যেতাম আমরা।

অবসন্ন গলায় হান্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কোথায়? আইসল্যান্ডে?'

ঘাড় নাড়ল হান্‌স্, 'না।'

'তাহলে কোথায়?'

উত্তর দিল না হান্‌স্।

নিজের দিকে চেয়ে দেখলাম প্রায় নগ্ন দেহ, ধুলোবালি, কালিতে ভূতের মত দেখাচ্ছে। একটু দূরে শ'পাঁচেক ফুট উঁচু পাহাড়ের চুড়া থেকে পনেরো মিনিট পর পর প্রচুর ধোঁয়া আর ছাই বেরোচ্ছে। থর থর করে কাঁপছে আমাদের পায়ের তলার মাটি।

পরিষ্কার নীল আকাশে গেঁজা তুলার মত সাদা মেঘ। আকাশে, বাতাসে, মাটিতে ছড়িয়ে আছে সূর্যের সোনালী আলো। বাতাসের সাথে নাক দিয়ে টেনে নিলাম সূর্যের প্রসন্ন আশীর্বাদ। আনন্দে দুলে উঠল বুক। কতদিন ওই আকাশ দেখিনি।

তাহলে, আবার ফিরে এসেছি পরিচিত পৃথিবীতে। সেই পুরাতন পৃথিবীর কোন দ্বীপে, যেখানে প্রাণ আছে, আলো আছে, আছে প্রকৃতির সবুজ স্নেহ। কিন্তু নাম কি জায়গাটার?

ছোটকাকা বললেন, 'কম্পাসের নির্দেশানুযায়ী জায়গাটা উত্তর মেরু হওয়া উচিত। কিন্তু চোখেই দেখতে পাচ্ছি, তা না। তবে যাই হোক, আর এখানে না। নিচে নামতে হবে এখুনি।'

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘণ্টা দু'য়েক বাদে পাহাড়ের গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম।

অজস্র ফলফুলের গাছ আশ পাশে। কারও বাগান হয়তো। মালিকের অনুমতি না নিয়েই সাবাড় করলাম ফল। সামনেই বয়ে যাচ্ছে ঝরনা। আকণ্ঠ পান করলাম ঠাণ্ডা পানি।

অদূরে গাছের আড়াল হতে একটা কিশোর ছেলে কৌতূহলী চোখে দেখছে আমাদের। আমাদের চেহারা দেখে বোধহয় ভয় পেয়েছে ছেলেটা। দৌড় দেয়ার আগেই ধরে ফেলল তাকে হান্‌স্।

জার্মান ভাষায় আস্তে করে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন ছোটকাকা, 'জায়গাটার নাম কি , খোকা?'

জবাব নেই।

বোঝা গেল জার্মানির কোন এলাকা নয় এটা। এবারে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'জায়গাটার নাম কি বল তো?' এবারও জবাব নেই দেখে ইটালীতে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। তবুও সে চুপ।

শেষে চটে গিয়ে ধমকে উঠলেন ছোটকাকা। চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা, 'স্ট্রম্বলি, স্ট্রম্বলি।' তারপর ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করেই দে দৌড়।

বিস্মিত কণ্ঠে বিড় বিড় করে উঠলাম, 'স্ট্রম্বলি!'

কোথায় আইসল্যাণ্ডের স্নেফেল পর্বত, আর কোথায় সিসিলির এটনা আগ্নেয়গিরি: একশো বা দু'শো নয়, তিনটে হাজার মাইলের ব্যবধান! স্তম্ভিত হয়ে এটনার দিকে তাকালাম আমি। ছোটকাকা বললেন, 'ফেলে দে হতচ্ছাড়া কম্পাসটা। সারাক্ষণই আমাদের ওটা ভুল পথ দেখিয়েছে।'

মাস ছ'য়েক পর হ্যামবুর্গের সেই ছোট্ট বাড়িটায় অধ্যাপক হের লিডেনব্রকের পড়ার ঘরটা ঝেড়ে মুছে সাজাচ্ছি। এমন সময় চোখ পড়ল সেই পুরানো কম্পাসটার উপর। পাতাল ভ্রমণের সঙ্গী ছিল বলে ছোটকাকা বললেও ফেলে দিইনি ওটাকে। দেখলাম, কম্পাসের কাঁটা যাকে দক্ষিণ নির্দেশ করছে, আসলে তা উত্তর দিক!

ছোটকাকাকে খবরটা দিতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'সত্যিই কাঁটাটা দিক বদল করেছে। এটনার মুখ দিয়ে বেরোবার সময়ও কাঁটাটা দক্ষিণ দিকেই ছিল।'

'কিন্তু এমন হলো কি করে?' জানতে চাইলাম আমি।

ছোটকাকা বললেন, 'পাতালের সাগর পাড়ি দেয়ার সময় একটা বৈদ্যুতিক বল ফেটেছিল আমাদের ভেলায়, মনে আছে? ভেলার সমস্ত লোহাই সেদিন চুম্বক হয়ে গিয়েছিল। কম্পাসের কাঁটাটাও বাদ যায়নি। তখন থেকেই ওলট পালট হয়ে যায় সব।' বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন ছোটকাকা।

সাথে সাথেই চোখের সামনে ভেসে উঠল, পাতাল সাগরে খড়কুটোর মত ভাসছে আমাদের ছোট্ট ভেলা। তার উপর লাফালাফি করছে একটা নীল-সাদা আগুনের বল, আর ঝড়ে ফুঁসছে লিডেনব্রক সী—পাতালের সাগর।

***

বাংলাপিডিএফ.নেট ১৫.০৫.১২ ইং তারিখ থেকে বইয়ের মাঝে সকল প্রকার ওয়াটারমার্ক প্রয়োগ বন্ধ করেছে। যাতে করে পাঠকদের বই পড়তে আরকোন সমস্যা না হয়। কিন্তু এতে করে আমাদের প্রচারে বাধা আসবে। তাই সকল পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি হয়ত আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বাংলাপিডিএফ.নেট

যেই বই চোরারা আমাদের বই চুরি করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে তাদের আসল বাবা অথবা মা কে, তারা মনে হয় সেটা জানে না। অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয় জা** । এরা চাইলে নিজের মা কেও বিক্রি করে দিতে পারে যে কোন সময়। তাদেরকে বলি এই চুরি বন্ধ কর। নাহলে লোকে তোদের সাথে তোদের বাবা মাকেও গালি দিবে। জানি এই কথা তোরা কানে নিবি না, কিন্তু তাহলে নিজেকে সত্যিকারের জা** হিসাবে প্রমাণ করবি।